জীবন ও সাহিত্য

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার প্রধান অধ্যাপক
রায় বাহাদুর
খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ. লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত

গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, লিমিটেড
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীকরুণাময় আচার্য্য,
রামকুমার মেশিন প্রেস,
২৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

"জীবন ও সাহিত্য" কয়েকটি নিবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে "শিল্পী ও শিল্প", "ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য", "ট্র্যাজিডির কথা", "স্বপ্ন ও সাহিত্য", "সাহিত্যের জাতীয়তা", "অবরুদ্ধ সাহিত্য", "সাহিত্যে পতিতা", "সমালোচনার কথা", "জীবন ও শিল্প", "রস ও জীবন", এবং "প্রবন্ধ শিল্প" এই কয়েকটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে নাটক ও নভেল বহু থাকিলেও প্রকৃত সাহিত্যরসযুক্ত প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প। এ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া লাভবান্ হওয়া যায় না, ইহাই সেই স্বল্পতার অন্যতম কারণ। লেখক দুর্লভ না হইলেও এইরূপ প্রবন্ধসাহিত্যের প্রকাশক সুদুর্লভ। এক্ষেত্রে যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। যে চিন্তাশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে এইরূপ নিবন্ধ পাঠের উপযোগী হয়, তাহা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিষয়টির সব দিক্ আলোচনা করিয়া তাহার মধ্যে রস সঞ্চার করিতে পারিলে, তবে সে প্রবন্ধ উপভোগ্য হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলি সেই ধরণের। মতের মিল সব সময়ে না হইলেও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। লেখকের চিন্তাশক্তি, যুক্তিপ্রিয়তা এবং প্রত্যেক জিনিষটি তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা পুস্তকখানিকে আদরণীয় করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

৬, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা,
২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

নিবেদন

প্রবন্ধকয়টি 'নারায়ণ', 'অলকা', 'বিজলী', 'কালি-কলম', 'কল্লোল', 'বাঙলার বাণী' এবং 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে প্রবন্ধগুলিকে সময়ানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হইয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের রেখাপাত প্রবন্ধে হওয়া অনিবার্য্য, এই কারণে আগাগোড়া সর্ব্বত্র হয়ত মতামতের সামঞ্জস্য নাও থাকিতে পারে। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে স্থায়িত্বের দাবী করিতে পারে এমন স্পর্দ্ধা লেখকের নাই। তবে যদি এই লেখাগুলি কোনো কোনো পাঠকের মনে কিছু কিছু চিন্তা জাগ্রত করে, তাহা হইলেই ইহারা সার্থক হইবে।

বাঙলা দেশে প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রকাশকবর্গের নিকট অবজ্ঞাত বলিয়াই জানি। তাহা না হইলে বাঙলা সাহিত্যের যে-সব প্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধ-সংগ্রহ পাওয়া আজ অসম্ভব হইত না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় এম্, এ, বি, এল মহাশয় যে সাগ্রহে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

লেখক

সূচী-পত্র

আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি যে, শিল্পবস্তু আমাদের চিত্তে একটি বিশেষ আনন্দকে বহন করিয়া আনে। এই আনন্দের স্বরূপ কি, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা শিল্পের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

শিল্পের ক্ষেত্রে 'ট্র্যাজিডি' বলিয়া যে একটি বস্তু আছে, তাহারই বিশ্লেষণ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শিল্পজ আনন্দ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, ট্র্যাজিডিই বিশেষভাবে শিল্প নামের যোগ্য; আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা এই একটি বিশেষ শিল্পরূপ লইয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

ট্র্যাজিডির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা যাহাই হোক, কোনো না কোনো রূপের মানবীয় সংঘর্ষমূলক বেদনাই যে ট্র্যাজিডির প্রাণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐক্যের জগতে, সমন্বয়ের জগতে ট্র্যাজিডি নাই, বেদনা নাই। যেখানে পরস্পর বিরোধী দুয়ের সংঘাত, সেখানেই দেখিতে পাই ট্র্যাজিডি—তাহা কল্পনার জগতেই হোক আর বাস্তব জগতেই হোক।

এই ট্র্যাজিডি ও কারুণ্য যে মানব-অনুভূতির একটি অতি-বড় সত্য, তাহা লইয়া বোধ করি তর্ক নাই। পাপ, দুঃখ, অন্যায়, এই সমস্তই মানব-প্রাণের কোনো না কোনোরূপ বিরোধানুভূতির নামান্তর মাত্র, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ট্র্যাজিডির জগৎ সোজা কথায় দুঃখের জগৎ; সেখানে যাহা চাই তাহা পাই না, প্রাণ সেখানে নিত্যকাল ধরিয়া ব্যর্থতার আঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি-জীবনের প্রচেষ্টা এই দুঃখের জগৎকে অতিক্রম করিয়া সামঞ্জস্যের জগতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য; যা হোক, সেই প্রচেষ্টার কোনো ইতিহাস বা তত্ত্বনির্ণয় আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। কিন্তু সাহিত্যে ট্র্যাজিডির বিকাশ দেখিয়া আমাদের মনে যে প্রশ্নটি জাগিয়া উঠে,

তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই যে ট্র্যাজিডির জগৎ, মানুষ কি ইহাকে একান্তভাবে ছাড়িতে চায়? এই জীবনে যে সব দুঃখের একটু আঁচ লাগিলেই আমরা 'ত্রাহি মধুসূদন' বলিয়া হাহাকার আরম্ভ করি, শিল্পে তাহারই আবার পরম সমাদর করি কেন? সুখের কল্পনায় স্বর্গ রচনার অর্থ বুঝিতে পারি, কিন্তু কল্পনায়ও মানুষের এই যে দুঃখ-ভোগের স্পৃহা তাহার অর্থ কোথায়? বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ, নিমাইসন্ন্যাস, রাণা প্রতাপের বিপুল ব্যর্থতার করুণ কাহিনী, ভ্রমরের দুঃখের জীবন, দেবদাসের অরুন্তুদ পরিণাম আমাদের প্রাণকে আনন্দ দেয় কেন?

ট্র্যাজিডি কিম্বা কারুণ্যপূর্ণ কাহিনী শুনিতে যে আমাদের ভাল লাগে, ইহাকে আনন্দ বলিয়া হয়ত ভাল করি নাই। নিমাই যেদিন স্বজন-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া ও শোকে মুহ্যমান করিয়া, গৃহত্যাগী হইয়া কেশমুণ্ডন করিলেন, সেদিনকার সে দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণ ভূমিতলে লুটাইয়া হাহাকার করিয়া উঠে নাই? কে তখনও শুষ্ক-নয়নে চাহিয়াছিল? আবার যখন সেই চিত্র আমাদের নয়নে ফুটিয়া উঠে, তেমনি করিয়া না হইলেও বেদনায় কাঁদি। রাণা প্রতাপের শেষ কান্নাও হৃদয়কে দুঃখাতুর করিয়া তোলে। কিন্তু তাহাতে কি আমরা কেবলই শোকগ্রস্ত হই?

এই আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে এমনিই ত দুঃখের অবধি নাই। শত সহস্র রকমের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, সাধারণ জীবনের দৈন্য-দারিদ্র্যের কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারি যে, দুঃখ আমাদের কতখানি অবাঞ্ছিত। তবু আমরা কত আগ্রহে থিয়েটারে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া সারাদিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও বিনিদ্র নয়নে কাঁদিয়া রাত কাটাইয়া দিই। দিনান্তের শ্রম-শেষে বিরাজ-বৌএর দুঃখে কাঁদিয়া শ্রম ভুলিবার চেষ্টা করি।

তবে কি আমরা দুঃখের ভিখারী? দুঃখই কি তবে আমাদের ঈপ্সিত বস্তু? 'অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি'র প্রচেষ্টা কি তবে ভুল? না, দুঃখকে চাই না, একথা অতি-বড় সত্য; যে দুঃখের কাহিনী পড়িয়া আনন্দ পাই, সেই দুঃখকেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ডাকিয়া আনিতে কিছুতেই চাই না। যে ট্র্যাজিডির নিদারুণ দুঃখকে দেখিয়া অন্তরে শিল্পীকে প্রশংসা করি, সেই ট্র্যাজিডি যদি আমারই জীবনে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে বসিনা। ট্র্যাজিডি পড়িয়াও দুঃখ পাই, ব্যক্তিগত জীবনেও দুঃখ পাই—উভয়ই দুঃখ হইলেও, ইহাদের মধ্যে তবু একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, রাণা প্রতাপের জীবন দেখিয়া যখন আমরা ব্যথিত হই, তখন সেই ব্যথার মধ্যেও 'আনন্দ' পাই—তাহার নিবৃত্তি কামনা করি না। প্রশ্ন জাগে—এই অনুভবগত তারতম্যের ভিত্তি কোথায়?

(২)

ট্র্যাজিডির মধ্যে এই যে আনন্দ, ইহার উপলব্ধি সম্ভব হয় কিসে তাহাই দেখা যাক। ভ্রমরকে আশ্রয় করিয়া জীবনের একটা ব্যর্থতা ও বিফলতা অতি করুণ রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যে জীবনের নিষ্ফল শূন্যতা, ইহা যদি আমার হইত, আমি যে তাহাতে এই 'আনন্দ' পাইতাম না তাহা নিশ্চয়, কেন-না তাহা হইলে আমি যে ভ্রমরই হইয়া যাইতাম। আবার আমি যদি কেবল এই বেদনার একান্ত ভিন্ন স্বতন্ত্র 'দ্রষ্টা'ই হইতাম, তাহাতেও আনন্দ দূরের কথা, কোনোরূপ অনুভূতিমূলক হৃদয়ের ভাবান্তরই আমার হইত না। কেবল দেখা ত জ্ঞানের ব্যাপার মাত্র, হৃদয় তাহার সঙ্গে কোনও নিত্য সম্বন্ধের দাবী রাখে না। তাই দেখিতে পাই, অনেক সময় যুক্তিবিচারে

যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা লইয়াও হৃদয় হাসে-কাঁদে, আবার যুক্তি যাহার দিকে হৃদয়কে টানিতে শত চেষ্টা করে, তাহাতে হৃদয় এতটুকুও সায় দেয় না। দ্রষ্টা সাক্ষী মাত্র, তাহার মধ্যে অনুভূতির রাগ-বিরাগের কোনো চাঞ্চল্য নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভ্রমরের জীবন-ট্র্যাজিডির 'আনন্দ' পাইতে গিয়া আমাকে ভ্রমর হইতে হয় ইহা বলাও যতটা সত্য, আমি ভ্রমর হই না, ইহা বলাও ততটাই সত্য। যদি ভ্রমর না হই, ভ্রমরের দুঃখ অনুভব করা অসম্ভব; কিন্তু ভ্রমরের মত হইলেও তাহার দুঃখে আনন্দ পাওয়া সম্ভব হইত না, কেন-না ব্যক্তিগত দুঃখের মোহ আছে, তাহা আতুর করে, আচ্ছন্ন করে, রসোপভোগের আনন্দ তাহাতে নাই। আসল কথা এই দাঁড়ায় যে, ভ্রমরের অতীত থাকিয়াও আমি ভ্রমর হইতে পারি—ইহাই ট্র্যাজিডির রসোপভোগের ভিত্তি। কিন্তু এই যে রসোপভোগ বা 'আনন্দ', ইহা সুখের নামান্তর মাত্র নহে; কেন-না দুঃখের চিত্রে এই যে আনন্দ, ইহাকে একেবারে দুঃখের বিপরীত বলিতেও যেমন পারি না, তেমনি সুখের স্বগোত্র বলিতেও বাণী সরে না। শিল্পবস্তু আমাদিগকে যে আনন্দ দেয়, উহা যে সাধারণ সুখদুঃখানুভূতি হইতে একটি পৃথক বস্তু, তাহাই দেখাইবার জন্য ট্র্যাজিডির আনন্দ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম; নতুবা শিল্পবস্তু মাত্রেই যে-আনন্দ দিয়া থাকে, তাহাকে সুখদুঃখ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শিল্পীর আনন্দ উপভোগের মূলে আমাদের এই কয়টি কথা স্বীকার করিতে হয়—(১) আমি আমার বিশেষ ব্যক্তিত্বটুকু ভুলিতে পারি না; আমি আমার অতীত হইতে পারি না; (২) আমি আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বর্জ্জন করিয়া অপর একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত (identify) করিতে পারি; (৩) সুতরাং আমি ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশিষ্ট হইলেও, আমি ব্যক্তিত্বের অতীত একটী সত্বা। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র যখন

ভ্রমর চিত্রাঙ্কনে মগ্ন, তখনকার বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বিশেষ বঙ্কিম নহেন, ভ্রমরও নহেন, এই যেমন একদিক্‌কার কথা, অপর দিক্‌ হইতে তেমনি বলা যায় তিনিই কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম এবং তিনিই ভ্রমর।

সুতরাং এই যে শিল্পী-আমি, ইহা একদিক্‌ দিয়া যেমন কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বদ্ধ নহে, তেমনি অপর দিক্‌ হইতে ইহা প্রত্যেক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে এক। তত্ত্বদৃষ্টির দিক্‌ দিয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, শিল্পী-আমি একই মুহূর্ত্তে দুইটি রূপে বিরাজিত, একটি তাহার বিশেষ রূপ, সর্ব্ববৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া, অনন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ ; আর একটি নির্ব্বিশেষ রূপ, সর্ব্ববৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত সেই রূপ, সুতরাং প্রকাশাতীত। দেশকালের সীমার মধ্যে এই শিল্পী-আমিকে বাঁধিবার উপায় নাই বলিয়াই এই শিল্পী-আমি ধারণা-গ্রাহ্য নহে। এই জন্যই যিনি সকল শিল্পের শিল্পী, বিশ্বসৃষ্টির যিনি কর্ত্তা, তাঁহার দেশকালাতীত নির্ব্বিশেষ রূপ অজ্ঞেয়, দেশকালের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শুধু সেই শিল্পীর আত্মপ্রকাশের লীলা। তাই এই বিশ্বজগৎ সেই মহান্‌ শিল্পীর অপূর্ব্ব রহস্যময় প্রকাশরূপ।

(৩)

শিল্পীর মধ্যে অপূর্ণতা নাই, শিল্পী-আমি পরিপূর্ণ ; তাই অনন্ত বিরোধ সেখানে অচিন্ত্য সামঞ্জস্যের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। পূর্ণ বলিয়াই তাহাকে আবৃত করিবার কিছু নাই, তাই শিল্পীর স্বরূপ হইতেছে প্রকাশময়, এই প্রকাশের পশ্চাতে অভাবের প্রেরণা—সুখের টান, অথবা দুঃখের তাড়না—কিছুই থাকিতে পারে না। শিল্পীর প্রকাশ সহজ আনন্দের স্বতোচ্ছ্বাস। মনে হয়, যাহা নিত্যকাল হইতে রহিয়াছে

তাহা নাই এই ভাণই মায়া, এই মায়ার আবরণটি উন্মোচন করিয়া স্রষ্টার এই যে আত্মপ্রকাশ, ইহাকে তাই কেহ (Jacob Boehme) "পূর্ণতার বেদনা" বলিয়াছেন, আর কেহ "অকারণ আনন্দের প্রকাশ" বলিয়াছেন।

এই জগতের যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, সকলই যেন প্রকাশের মুখে চলিয়াছে। এই বিশ্বপ্রকৃতির মুখের উপর কবে যেন কোন্ মায়ার অবগুণ্ঠন পড়িয়াছিল, সেই অবগুণ্ঠন যতই সরিয়া যায়, ততই যেন অনন্ত অপ্রকাশের অস্তিত্ব আরো সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; কবে "প্রকৃতি সাবধানী হইয়া গেছে" জানিনা, আজ শুধু ক্ষণিকের দেখার আভাসে না-জানার রহস্যই বিপুল হইয়া উঠে। যে অনন্তরূপ দেশকালাতীত বিন্দুর মধ্যে সংহত হইয়া আছে, তাহাই দেশকালের মধ্যে ক্রমোন্মেষময়। এই প্রকাশের দিকে চাহিয়া আনন্দের পূর্ণতা নাই; খণ্ডদৃষ্টির সম্মুখে এই সৃষ্টি প্রকাশ-অপ্রকাশের একটা দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির চোখে প্রকৃতির অর্দ্ধ-ব্যক্ত, অর্দ্ধ-অব্যক্ত রূপ তাই পূর্ণতার বিরতি আনে না।

এমার্সন (Emerson) এই জগৎরূপটিকে "The Flying Perfect" বা "চলচঞ্চল পূর্ণতা" নাম দিয়াছেন, এই ক্রমপ্রকাশের মাঝে ভাঙ্গা ও গড়া, দুই একই সঙ্গে চলিতেছে। এক সঙ্গে বলিলেও ভুল বলা হয়, কারণ একটি ব্যাপারকেই এক দিক্ হইতে ভাঙ্গা ও আর এক দিক হইতে গড়া বলা হইতেছে। ক্রমবিস্তৃতিশীল একটি বৃত্তাকার তরঙ্গের কল্পনা করিলে কথাটি সহজেই বোঝা যাইতে পারে। যাহা পূর্ণ তাহাই কালপ্রবাহের পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। মনে করা যাক যে, একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত হইতে আর একটি বৃহত্তর বৃত্তে এই প্রকাশ অগ্রসর হইল। এই প্রকাশ বা সৃষ্টি ব্যাপারটি এক দিক্ হইতে ভাঙ্গা, কেন-না ক্ষুদ্রবৃত্তের বিনাশই ইহার একটি দিক্। বৃহত্তর বৃত্তের সৃষ্টিও আবার এই ব্যাপারেরই আর এক দিক্। এই ভাঙ্গাগড়া ব্যাপারটিকে তাহার পরিপূর্ণ

সত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয়, প্রকাশ একটি অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপার মাত্র। কিন্তু উহাকেই পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিয়া দেখিলে কখনো ভাঙ্গা বলিতে হয়, আবার কখনও গড়া বলিতে হয়।

বিশুদ্ধ প্রকাশের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উহাকে আনন্দাত্মক বলিব, আবার উহাকেই ভাঙ্গাগড়া হিসাবে দেখিতে গেলে সুখদুঃখাত্মক বলিব। প্রকাশ ব্যাপারটি যেমন পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে ভাঙ্গাগড়ার দ্বিধা-বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তেমনি শিল্পী-আমির উপভোগ্য আনন্দবস্তুটিও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে সুখদুঃখের রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। সুতরাং ব্যক্তি যতক্ষণ তাহার এই একান্ত পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের গণ্ডীকে ধ্বংস করিতে না পারে, ততক্ষণ আনন্দবস্তুর আস্বাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব থাকিয়া যায়।

কিন্তু তবু আমরা সাধারণতঃ সুখ ও আনন্দ, এই দুইটি কথার মাঝে অনুভবগত একটা সাধর্ম্ম্য দেখিতে পাই, ইহার কি কোনো হেতুই নাই? পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সৃষ্টি পূর্ণপ্রকাশ রূপ না হইলেও প্রকাশ-অপ্রকাশের মিশ্রণ। সুতরাং যে পরিমাণে এই বিশেষ ব্যক্তিটি প্রকাশের সহায়ক, সেই পরিমাণে সে আনন্দেরও ভোক্তা, কিন্তু অপ্রকাশটুকুর জন্য এই আনন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, খণ্ডতা, নশ্বরতা ও চঞ্চলতার অধীন হইয়া পড়ে। এই কারণেই উক্ত আনন্দকে আনন্দ না বলিয়া আনন্দাভাস বা সুখ বলিতে হয়।

যতক্ষণ এই কালপ্রবাহের মাঝে আমি একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের অভিমানে সীমাবদ্ধ হইয়া আছি, ততক্ষণ আমার মধ্যে পূর্ণাপূর্ণ এই দুইটি ভাবের মিশ্রণ রহিয়াছে। আমি ক্ষুদ্রতর বিকাশ হইতে বৃহত্তর বিকাশ পাইয়াছি, এই দিক্ দিয়া আমি পূর্ণতার আস্বাদন করিয়া সুখী, আবার আমার এই ব্যক্তিত্ব ও বৃহত্তর বিকাশের টানে ভাঙ্গিতে আরম্ভ

করিয়াছে নানা দিক্ দিয়া—তাই আমি দুঃখী। তাই যতক্ষণ কালপ্রবাহের মধ্যে আমি পরিচ্ছিন্ন হইয়া আছি, ততক্ষণ আমি সুখ-দুঃখের দাস না হইয়া পারি না; সুখ-দুঃখের চাঞ্চল্য ছাড়িয়া পূর্ণানন্দের পরমবিরতি কিছুতেই পাই না। কিন্তু যদি এই সকল অনন্ত ব্যক্তিত্বের দেশকালাতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে এই পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ-দুঃখ আনন্দস্বরূপে অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। তখন বিনাশের মূর্ত্তিকেও, ট্র্যাজিডিকেও আনন্দস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারি।

(৪)

সাধারণ ভাষায় যাহাকে আমরা শিল্পী বলি, তাহার দিকে চাহিয়া দেখি যে, যতক্ষণ সে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি, ততক্ষণ তাহার শিল্পী হওয়াই অসম্ভব; কারণ শিল্পী-আমি সকল বিশেষ-আমির গণ্ডীর অতীত। বাঁশের কঞ্চি যতক্ষণ তাহার বিশেষত্ব লইয়া আছে, ততক্ষণ তাহা বাঁশি নয়। বাঁশি হইলেই সে আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া অদৃশ্য, অশ্রুত সুরটির প্রকাশের পথ করিয়া দেয়। তখনই বাঁশির মাঝ দিয়া বাঁশের অতীত সুরতরঙ্গের প্রকাশ সম্ভব হয়।

শিল্পী বলিতে আমরা সেই দেশকালাতীত শিল্পী-আমিকে না বুঝিয়া সাধারণতঃ যাহার ভিতর শিল্পী-আমির প্রকাশ ঘটে, তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের সাধারণ ভাষায় শিল্পী তাহাকেই বলিব যে আপনার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া সেই শিল্পী-আমির স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কি করিয়া হইতে পারে, তাহা আপাততঃ আলোচনার বিষয় নহে। সকলেরই মাঝে শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই পরম অব্যক্তেরই একটি দিকের প্রকাশ মাত্র। যে

বিন্দু কেন্দ্রে থাকিয়া শিল্পী নাম ধরিয়াছে, সেই বিন্দুটিই পরিধি-পথে, সৃষ্টিচক্রে অনন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রচার করিয়াছে। সমস্ত পরিধি-গত বিন্দুর স্বরূপ ও বন্ধন যেমন কেন্দ্রে, তেমনি সকল বিশেষের স্বরূপ ও মিলনও ওই শিল্পী-আমিরই মাঝে। শিল্পী-আমিই বিশেষ-আমির মুক্তিক্ষেত্র। ট্র্যাজিডিতে যে বিশেষ-আমি আনন্দ পায়, তাহাই বিশেষ-আমির এই মুক্তির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করে।

(৫)

যতক্ষণ আমি শিল্পী, ততক্ষণ আমি কোন বিশেষ-আমি নই; আমি তখন স্বতন্ত্র, পূর্ণ এবং নিয়মাতীত, আমার প্রকাশ তখন অব্যাহত। তখন আমি একটি নিরপেক্ষ (absolute) সত্তা, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দেশকালে ফিরিয়া আসিয়া বিশেষ কোনো রূপের মধ্যে আপনাকে বিশিষ্ট করিয়া আবদ্ধ করিলাম, তখন আমি পরবশ, নিয়ম যমের দণ্ড তখন আমার শাসক। সুতরাং শিল্পী-আমির নিকট যাহা নিয়মাতীত জগৎ (amoral world), বিশিষ্ট-আমির পক্ষে তাহাই নিয়মাধীন জগৎ (moral world), বিশিষ্ট-আমি নিয়মনিগড় ছেদন করিতে অসমর্থ। বদ্ধ ও মুক্তের, সাধক ও সিদ্ধের ইহাই ভেদ।

সুতরাং শিল্প কোনো নিয়মাধীন না হইলেও শিল্পের বহিরঙ্গটি (physical expression) দেশকালে প্রকাশিত বলিয়া খণ্ডমানবের পক্ষে তাহার একটা নৈতিক মূল্য (moral valuation) আছে তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু খণ্ডমানবের দৃষ্টিগত এই নৈতিক মূল্যের অপেক্ষা করিয়া শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি বদ্ধ থাকিতে পারে না। শিল্পের প্রকাশ অব্যাহত, শিল্পী-আমি অত্যন্ত স্বাধীন।

খণ্ড-আমি শিল্পীর জগতে প্রবেশ করিতেই পারে না, সুতরাং ন্যায়তঃ শিল্পসৃষ্টির উপর তাহার কোনো অধিকারই নাই। শিল্প ও শিল্পী পরস্পর এমন বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্পর্কে বদ্ধ, যে যেখানে শিল্পীর দৃষ্টি নাই, সেখানে শিল্পও নাই; সুতরাং খণ্ডমানব তাহার দর্শনই পায় না। ফল কথা, শিল্পীর জগতে নিয়ম বা নীতিশাসনের কোনোই স্থান নাই।

(৬)

তবে শিল্পে ও ধর্ম্মে এই যে বিরোধের কথা শোনা যায়, তাহার কি কোনো ভিত্তি নাই? নিশ্চয়ই ইহার মূলে কোনো ভ্রান্তি রহিয়াছে, কেন-না তত্ত্বতঃ শিল্প ও নীতিধর্ম্মের জগতে একটি একান্ত বিচ্ছেদ রহিয়াছে। মনে করা যাক, শিল্পী-আমি আপনাকে দেশকালে কোনো একটি বিশেষ রূপে প্রকাশ করিলেন। তত্ত্বতঃ, এই রূপ দেশকালের অতীত হইয়াও দেশকালে প্রতীত হইল মাত্র। শিল্পী-আমির নিকট উহার প্রকাশ ও বিনাশ উভয়ই মিথ্যা। কারণ বিম্ব যেখানে নিত্য, প্রতিবিম্বও সেখানে নিত্য। সুতরাং খণ্ড-আমির নিকটই বিনাশ কথাটির অর্থ আছে; শিল্পী-আমির নিকট তথাকথিত প্রকাশ ও বিনাশ দুইই প্রকাশময়।

তবে গোল বাধে কেমন করিয়া? যে ব্যক্তি শিল্পী, যাহার মাঝ দিয়া শিল্পী-আমির প্রকাশ সাধিত হয়, সেই খণ্ড-আমি আপনার মিথ্যা অহঙ্কারের বশে শিল্পের বহিঃপ্রকাশটিকে আমার বলিয়া দাবী করিয়া বসে এবং খণ্ডজ্ঞানবশতঃ অনন্তকালের ক্ষেত্রে সেই শিল্পটিকেই চরম করিয়া দেখিতে চায়।

আবার এদিকে শিল্পবস্তু দেশকালে প্রকাশিত বলিয়াই মানবদৃষ্টিতে তাহা নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে; জগতের শিল্পমূর্ত্তি খণ্ড-মানবের কাছে সুখ-

দুঃখের দ্বন্দ্বময় মূর্ত্তি লইয়া আসে। তখন শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্প মানবদৃষ্টির মাঝ দিয়া অখণ্ডতা হারাইয়া সুখ-দুঃখের নিদান হইয়া পড়ে। শিল্পীর শিল্প তাহাতে কণামাত্রও ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শিল্পী-অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তিটি আপনার খণ্ডতাবশতঃই অন্যের খণ্ড-বিচারে চঞ্চল হইয়া উঠে। শিল্প প্রশংসিত হইলে খণ্ড-আমিটি আত্মপ্রশংসায় স্ফীত হইয়া উঠে, আবার নিন্দায়ও তেমনি ক্ষুব্ধ হইতে থাকে, সে কখনো সুখ-দুঃখকে অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে না; আমিত্বের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব আসিয়া পড়ে। নতুবা শিল্পীর ক্ষোভের কোনোই কারণ থাকিতে পারে না। শিল্প নিত্য, শিল্পীর প্রকাশেই তাহার আনন্দ পরিপূর্ণ।

সমাজ আপনার রুচিমত ভালমন্দ বিচার করিবেই, নিয়ম না মানিয়া তাহার চলে না, যমের শাসন তাহাকে মানিতেই হয়। সমাজ শিল্পের বিচার করিতেছে মনে করিয়া যেমন ভুল করে, অহঙ্কারী ব্যক্তিও বৃথা ক্ষুব্ধ হইয়া শুধু ব্যক্তিগত জীবনের বিরোধকে ফুটাইয়া তোলে। সমাজ বিচার করে শুধু বহিরঙ্গের; কিন্তু শিল্প যে শুধু বহিরঙ্গটুকুই নয়, শিল্পীর দৃষ্টিযোগেই যে শিল্পের স্বরূপ এবং অর্থ পরিপূর্ণ, সেই কথাটি সেও যেমন ভুলিয়া যায়, ব্যক্তি-শিল্পীও তেমনি আপনার সীমাবদ্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সত্য শিল্পস্বরূপটিকে হারাইয়া ফেলে।

(৭)

শিল্পী-আমির এক একটি দিক্ এক একটি ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত; বিশ্বশিল্পীর মধ্যে এই অনন্ত ব্যক্তিত্ব একটি বিরাট ঐক্যে বিধৃত, কিন্তু ব্যক্তির ভূমি হইতে দেখিতে গেলে উহারা পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ্বশিল্পীর একটি বিশেষ প্রকাশ বলিয়াই, প্রত্যেক ব্যক্তি

বিশ্বশিল্পীর সহিত একটি বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ। ব্যক্তিকে যদি ওই বিশ্বশিল্পীর সহিত যুক্ত হইতে (অর্থাৎ যুক্ত বলিয়া অনুভব করিতে) হয়, যদি তাহাকে তাহার স্বরূপে ফিরিতে হয়, তাহা হইলে সেই বিশেষ সম্বন্ধের দিক্ বা পন্থা ধরিয়াই তাহাকে যাইতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ-সিদ্ধির একটি স্বতন্ত্র গোপন পথ আছে—যে পথ দিয়া তাহাকে এবং কেবল-মাত্র তাহাকেই বিশ্বশিল্পীর সন্ধানে মিলনযাত্রা করিতে হয়। কিন্তু শিল্পীর সহিত স্বারূপ্য লাভ হইয়া গেলে তখন আর কোনো দিক্ বা পথের বন্ধন থাকে না; কেন-না, শিল্পী সকল পথের অতীত, সকল পথের লক্ষ্য বস্তু। তখন যাহা কিছু দেখি তাহা আমারই প্রকাশ বলিয়া শিল্পব্যতিরিক্ত কিছুই সেখানে থাকিতে পারে না। তখন সকলই শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে বলিয়াই অসুন্দর বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না।

যদিও তত্ত্বতঃ যাহা কিছু আছে তাহাকে অসুন্দর বলা যায় না, তথাপি আমরা বিশেষ-আমি বলিয়াই এই পরমসুন্দর সৃষ্টির উপর ভালমন্দের বর্ণে রঞ্জিত তথাকথিত সুন্দর অসুন্দরের পরদা টানিয়া দিয়া প্রকৃত সৌন্দর্যটিকে আড়াল করিয়া দিই। কিন্তু সৌন্দর্য আমাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবার বস্তু নহে; কৃষ্ণের এই সৌন্দর্য্যের বাঁশিটি এক এক দিন এমন করিয়া বাজিয়া উঠে যে আর সাংসারিক ভাল-মন্দের, কুলমানের বাঁধনে অন্তরাত্মাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। সে আমাদের ব্যক্তিত্বের আবরণকে অপসারিত করিয়া দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সেই বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব্ব জগতের দৃশ্য দেখাইয়া দিয়া যায়। অনন্তের দূত কখনো বিফল হইয়া ফিরিয়া যায় না।

সে ধীরে ধীরে আমাদের ভাল-লাগার মাঝ দিয়া আড়াল হইয়া কি জানি কোন্ ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া প্রাণে কিসের মাদকতা সঞ্চারিত করিয়া দেয়, সংসারের কাজে ভুল হইতে থাকে; তার পর কেমন করিয়া বিবশ

করিয়া চলিয়া যায়। তখন মনে হয় যেন কতকাল কারাগারে পড়িয়া আছি। তখন জটিলা-কুটিলার তাড়নায় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। এই ভালমন্দের জাল কাটিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। মুক্তির ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য এই অনন্তের দূত আমাদের নিকট প্রতিনিয়তই আসা-যাওয়া করিতেছে। সে যে বাণী লইয়া, যে নিমন্ত্রণ লইয়া আসিয়াছে, তাহা দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে; কিন্তু আমাদের রুদ্ধ দ্বার খোলে না। তবু কখন কোন্ দিক্ দিয়া যে সে আমাদের "একটু পথের বাইরে" আনিয়া ফেলিবে, তাহার চেষ্টায় সে সতত সজাগ হইয়া আমাদের চারিপাশে ঘুরিতেছে।

(৮)

কিন্তু আপনাকে না ভুলিলে যে সংসারের কাজ আর ফুরায় না। মানুষও তো এই সংসারের কাজ চায় না, তাহাতে যে তাহার মুক্তি নাই। ব্যক্তিত্ববিলয় বিনা যে মুক্তি নাই। মানুষ সর্ব্বদাই একটি গণ্ডীর মধ্যে নদীর মত বদ্ধ হইয়া আপনাকে না জানি কোন্ অসীমে হারাইবার সাধনা করিতেছে, ইহাই তাহার সত্য সাধনা। বিশেষ সর্ব্বদাই বিশেষাতীতের মধ্যে আপনার পরিচয়ের এবং প্রতিষ্ঠার সন্ধান করিতেছে।

বিশ্বশিল্পীর দিক্ হইতে ব্যক্তি তাহার একটি প্রকাশ মাত্র। কিন্তু ব্যক্তির দিক্ হইতে শিল্পী তাহার সাধনার লক্ষ্য। ব্যক্তি অন্তরে মনে তাহাকেই চায়। বিশেষ-ব্যক্তির সাধনা আত্মমগ্নতার সাধনা, আত্ম-বিলয়ের সাধনা। ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বা সীমার অহঙ্কার আছে, তাহার বিলয় ব্যতীত শিল্পী-আমির সহিত যোগ বা স্বরূপসিদ্ধি অসম্ভব। ধ্যানই এই আত্মমগ্নতার বা বিশ্বযোগের উপায়। যাহা ব্যক্তির অহংটিকে

কেবলই প্রচণ্ড ও স্বতন্ত্র করিয়া তোলে, তাহা বিরোধকেই তূর্য্যধ্বনি করিয়া জাগাইয়া তোলে মাত্র। আত্মস্বাতন্ত্র্যানুভূতি শিল্পসাধনার ভীষণ অন্তরায়। ধ্যান বিনা আত্মবিলয় হয় না, এবং আত্মবিলয় বিনা শিল্পী হওয়ার আর অন্য পন্থা নাই।

যুগে যুগে নানা পথের পথিকও শেষে ঐ একই কথা বলিয়া আপনাদের কথা শেষ করিয়াছেন দেখিতে পাই। খ্রীষ্টীয় সাধনায় ব্যক্তিত্ববিলয়ের উপদেশ আছে, মহম্মদীয় সুফী সাধকদের মুখেও ঐ কথাই শুনিতে পাই, আর হিন্দুর দেশে অহঙ্কারলোপের কথাই ত জীবন-সাধনার চরম কথা। তবে বাহিরের দিক্ দিয়া প্রক্রিয়াগত উপায় ভিন্ন ভিন্ন।

শিল্পসাধনার লক্ষ্য এই ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হইতে মুক্তির চেষ্টা। সহজ কথায় বলিতে গেলে শিল্প-সাধনাকে বলিব সৌন্দর্য্যের উপাসনা। ইহা সাধনা—আরামের উচ্ছৃঙ্খলতা নয়; উপাসনা—উপভোগের আয়োজন নয়। সাধারণ মানবজীবনে উত্তম ভোগাবস্তু দেখিলে যে এক প্রকার আনন্দ হয়, আর ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমটির মধ্যে যে আনন্দ পাই তাহাতে ক্ষণিকের আনন্দাভাস আসিলেও পরমুহূর্ত্তেই উহা আমাদের অহংবোধটিকে সজাগ ও প্রবল করিয়া তোলে। ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে আমার যে ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ, তাহা আসিয়া শিল্পানন্দলাভের পথটিকে কণ্টকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খণ্ডতার বোধ আসিয়া আনন্দকে মলিন ও স্বরূপচ্যুত করিয়া ফেলে। আনন্দের মধ্যে শিল্পী-আমির যে একটি পরিপূর্ণতার বিরাম আছে, অহঙ্কারের আলোড়নে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অথচ অন্যটি দেখিয়া আমি যে বুদ্ধ-প্রতিরূপ দেখিতেছি তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, আমার সহিত ধ্যানীবুদ্ধের স্বরূপের একাত্মতা স্থাপন হইয়া যায়, এবং তজ্জনিত বিশুদ্ধ অখণ্ড আনন্দে সব পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মোট কথা, শিল্পরূপটি বা

আনন্দের অবলম্বন ও উদ্দীপকটি এমন হওয়া চাই যাহাতে সে আমার অহংবোধকে তীব্র না করিয়া আমাকে আত্মবিস্মৃত করিতে পারে। মনীষি-শ্রেষ্ঠ কাণ্টও (Kant) কি এই জন্যই শিল্পরূপটিকে "an object of disinterested satisfaction" অর্থাৎ "নিঃস্বার্থতৃপ্তিদায়ক" বলিয়াছেন ?

কোনো একটি শিল্পরূপ বিশেষ কোনো যুগে এবং দেশে আনন্দ দান করিলেই যে তাহা অন্য যুগে এবং দেশেও আনন্দ দিবে তাহা বলা যায় না। (অবশ্য শিল্পী-আমির দিক্ দিয়া এ-কথা উঠিতেই পারে না, কারণ শিল্পী-আমি দেশ-কালাতীত।) মানব-ব্যক্তিত্ব যুগে যুগে, দেশে দেশে, বিভিন্ন বলিয়া তাহার অহঙ্কার সকল দেশে, সকল সময়ে একই রূপকে আশ্রয় করিয়া প্রবল অথবা মুগ্ধ হয় না। তাই সীমাবদ্ধ মানুষের দিক্ হইতে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, প্রতি যুগে, প্রতি দেশে মানবব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরূপ (art-forms) পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শিল্পের বা শিল্পীর আনন্দের লক্ষণের মাঝে কোথাও বৈগুণ্য আসিতে পারে না। কোনো শিল্প-সমালোচনা যদি সম্ভব হয়, তবে সেই সমালোচনা শুধু এই বিচার করিতে পারে যে, কোনো বিশেষ শিল্পরূপ সেই যুগের চিত্তের সাধনাকুল কি না। কিন্তু ইহা দ্বারা শিল্পের নিরপেক্ষ ভাল-মন্দ বা শিল্পত্ব লইয়া কোনো মীমাংসাই করা যাইতে পারে না।

(৯)

প্রতি যুগে, প্রতি দেশে, মানবাত্মার মধ্যে দুইটি ভাবের প্রকাশ হইয়া আসিয়াছে ; একটি কেবলই মানুষের ব্যক্তিত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ ও তীব্র করিতেছে, আর একটি তাহার ব্যক্তিত্ববিলয়ের দিকে ; একটি সর্ব্বত্র স্বপ্রধান হইবার আশা—কেবলই দ্বন্দ্ব এবং বিরোধকে আহ্বান করিতেছে,

আর একটি আপনাকে বিলাইয়া দিবার প্রেরণায়—ব্যাকুলতায় কাঁদিতেছে। মানবজীবনে ভগবানের ও সয়তানের, দেবাসুরের অনন্ত সংগ্রাম সততই চলিয়াছে। ভাবের দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্রই কোনো একটি রূপকে লইয়া। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপকে আশ্রয় করিয়া এই দুইটি ভাবের সংগ্রাম চলিতে থাকে। শিল্পসাধনা প্রত্যেক যুগে সেই রূপটিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে, যাহার মাঝ দিয়া সাধক আপনার আত্মমগ্নতাকে, ধ্যানকে সহজ ও নিবিড় করিয়া তুলিতে পারে। প্রবৃত্তির পথে সাধনা চলিতে পারে না। তবে আমার নিকট যাহা শিল্পসাধনার সহায়, অপরের নিকট তাহা নাও হইতে পারে। আমার জাতি বা সমাজগত সংস্কার যাহাকে শিল্পসাধনার সহায় বলিয়া মানিতেছে, অন্য দেশে তাহা নাও হইতে পারে, এমন কি অন্তরায় পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কিন্তু একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত যে, কোনো বিশেষ শিল্পরূপ সাধনার পথেই কেবল সহায় ও অন্তরায় হইতে পারে, কিন্তু সাধনার শেষে কোনো শিল্পরূপই অন্তরায় বা সহায়রূপে দেখা দেয় না ; তখন উহা কেবল শিল্প, আনন্দেরই উদ্বোধক।

শিল্পসাধক কখনো উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার আশ্রয় লইয়া পথ চলিতে পারে না। কল্পনা সাধকের নিকট যেমন বরদামূর্ত্তি লইয়া দাঁড়ায়, তেমনি আবার মোহময়ী সাজিয়া সাধনা বিফল করিতেও আসে, ইহা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধকের পথ সর্ব্বত্রই শত বিঘ্নসঙ্কুল, কোথাও নিষ্কণ্টক নহে। শিল্পসাধকের ধ্যানমূর্ত্তিটি তাহার উপাসনার মূর্ত্তি ; সেই মূর্ত্তিই উপাসনার লক্ষ্য—যাহার মধ্যে আমি আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন দিতে অধীর, ভোগের ছলনামুগ্ধ সাধকের বিপদ এইখানে। অনেক সময় ভোগের লক্ষ্যটিকে উপাসনার আসনে বসাইয়া সাধক আপনার পতনের পথ সহজ করিয়া তোলে। এখানে শিল্পীগুরুর কৃপাভিক্ষা ভিন্ন আর উপায় নাই। শিল্প-

সাধকেরও কল্পনার কঠোর সংযম চাই, তাহা না হইলে আলেয়ার অনুসরণ করিয়া বাসনার অন্ধকূপে পড়িয়া মরিতে হয়, সিদ্ধির শুভ্র-মন্দির-তলে আর যাওয়া ঘটিয়া উঠে না।

(১০)

এই শিল্পসাধনা মানব যুগে যুগে করিয়াছে, করিবে। নানা নামে এই সাধনা থাকিবেই ; অবশ্য মানবচিত্তের ভিত্তিই যদি অন্য কিছু হইয়া যায়, তবে স্বতন্ত্র কথা। আমরা যাহাকে 'শিল্পী' বলি, তাহাকে একদিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হয় কেবল পরম শিল্পীর যন্ত্র মাত্র ; ইওলীয় বীণার মত বিশেষ ব্যক্তিটি এখানে শিল্পীর বিচিত্র প্রকাশের সহায়ক মাত্র। যেমন একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র একটি বিশেষ প্রকার সুরের প্রকাশের সহায়ক মাত্র, উহাকে যেমন সুরের অসম্পূর্ণ প্রকাশের কারণ মনে করিতে পারি না, তেমনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মাঝ দিয়া শিল্পের প্রকাশটি একটি বিশেষ বৈচিত্র্যে ফুটিয়া উঠে মাত্র, ব্যক্তিত্ব শিল্পে কোনো দোষ আনিতে পারে না। তবে যদি বেহালার ভঙ্গী সেতারে ফুটিল না বলিয়া আক্ষেপ করি, সে স্বতন্ত্র কথা। আবার এই 'শিল্পী'র ব্যক্তিগত জীবনের দিক্ হইতে দেখিলে তাহাকে সাধকও বলিতে পারি। আমরা যাহাকে সাধারণ ভাষায় শিল্পী বলিয়া থাকি তাহার দুইটি দিক্ আছে। এক দিক্ হইতে দেখিলে তাহাকে বলি সাধক, পথের যাত্রী ; আর একদিক্ হইতে দেখিলে তাহাকেই অনন্তের একটি বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ বলিয়া বুঝিতে পারি। এক একদিক্ হইতে সে অপূর্ণ, চঞ্চল ; আর একদিক্ হইতে সেই আত্মস্থ, আপনাতেই আপনার প্রকাশকে সম্পূর্ণ করিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক মানুষকেই আমরা এই দুইটি রূপে দেখিতে পারি। তাহাকে নারায়ণ

বলাও যত সত্য, অপূর্ণ এবং মোহগ্রস্ত বলাও ততটাই সত্য; দ্রষ্টার দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর এই দেখার বিশিষ্টতা নির্ভর করে।

একদিক্ হইতে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাই একটি নদী অনন্তের সাড়া পাইয়া, কত পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, কত বাধা-বিঘ্নের মাঝ দিয়া, কত দুঃখ ও বেদনার আঘাত খাইতে খাইতে সে যেন অন্ধের মত কিসের দুর্দ্দম্য তাড়নায় কোথায় চলিয়াছে। মাঝে মাঝে জোয়ারের জল যখন আসিয়া তাহার বুক ভরিয়া দেয়, তখন ক্ষণেকের তরে যেন নদী বুঝিতে পারে কোথায় তাহার গতি ও পরিণতি। তখন মুহূর্ত্তের জন্য একটা স্থৈর্য্য আসে; আবার চঞ্চলতা, আবার নিরুদ্দেশের অনিবার আকর্ষণ! কিন্তু আর একদিক্ হইতে চাহিয়া দেখি, এক অনন্ত সমুদ্র দিকে দিগন্তে অনন্ত বাহু বাড়াইয়া কত খেলা খেলিতেছে, কত দুলিতেছে, ফুলিতেছে—সে আনন্দের অপরূপ খেয়াল! তাহার মাঝে এক অবাধ মুক্তির আনন্দ নিয়তই নানাছন্দে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধক 'শিল্পী' ক্ষণে ক্ষণে আপনার প্রার্থিত পদের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে মাত্র; মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া সে সত্যই শিল্পী-আমির নির্ব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহার কোনো স্থায়িত্ব নাই। উহা লইয়া যে সাধক 'সিদ্ধ হইয়াছি' এই অহঙ্কার করিতে বসে, তাহার কেবল ভুলই বাড়িয়া চলে।

শিল্পসাধনার পথে মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে আমি শিল্পসাধক বলিয়াই, আমি আমার এই অপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে শিল্পী-আমির অসীমতার মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে চাহি বলিয়াই, আমার বিশেষ পন্থা অবলম্বন ভিন্ন গতি নাই। আমার ধ্যানরূপকে, আমার শিল্পরূপকে আমার প্রকৃতির অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লইয়া আসিতেই হইবে। সাধক মাত্রেরই উপাস্যরূপ একটি বিশেষ রূপ, উহা কখনো নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। কিন্তু

সাধনার শেষেও যে বিশেষমাত্রই আছে তাহা যেন মনে না করি। বিশেষকে ধরিয়া যাত্রা আমার নির্ব্বিশেষের পানে, শিল্পীর আমিত্বে ব্যক্তির খণ্ডব্যক্তিত্বের পর্য্যবসান এবং এই শিল্পীর আমিত্বটি নির্ব্বিশেষ বলিয়াই যে সকল-আমির চরম ঐক্যভূমি, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং দেখিতেছি শিল্পটিই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলা যতটা সত্য, শিল্পী হওয়া আমার সাধনার একমাত্র প্রার্থিত বলাও ততটাই সত্য।

সিদ্ধির ভূমিই সেই শিল্পী-আমির ভূমি, এবং সেখানে যাহা আছে তাহাই সুন্দর।

(১১)

অনন্তের এই যে সীমার মাঝে প্রকাশ, ইহাই আমাদের শিল্পরূপ। অনন্তের দিক্ দিয়া, শিল্পী-দৃষ্টির দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে এই প্রকাশ অব্যাহত, দেশকাল তাহার বন্ধন নয়, প্রকাশলীলার অবলম্বন মাত্র। কিন্তু খণ্ডদৃষ্টির দ্বারা আমরা দেখি কেবলই সীমা, কেবলই বন্ধন। যখন কোনো দেশপ্রেমিক বা বিশ্বপ্রেমিক প্রেমের একান্ত আনন্দে কোনো গুরু বেদনাভার মাথায় করিয়া লন তাহাতে তাঁহার আনন্দ আরো প্রকাশঘন হইয়া উঠে, কিন্তু বাহির হইতে দেখি শুধু দুঃখযাতনার শত বন্ধনের নাগপাশ তাঁহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সীমার মধ্যে প্রকাশ অনন্তের কোনো ক্ষুণ্ণতা আনয়ন করে না, উহা আমাদের খণ্ডদৃষ্টির ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র।

প্রকাশ অনন্তের স্বধর্ম্ম; তাহাকে আবৃত করিবার কিছুই নাই, কারণ তাহাকে প্রকাশ করিবার কিছু নাই, সে স্বয়ং প্রকাশ। তবু যুক্তির দ্বৈতবাদের মধ্যে পড়িয়া আমরা এই বিশুদ্ধ কেবল প্রকাশকে দুইয়ের

ধাঁধায় ফেলিয়া দিই। তখন প্রশ্ন করি কিসের প্রকাশ? আমি খণ্ড বলিয়াই এইরূপ প্রশ্ন সম্ভব হইয়াছে। যেখানে অখণ্ড সত্তাই শুধু আছে, সেখানে এই প্রশ্নই উঠে না, সেখানে শিল্পী ও শিল্প একান্ত অভিন্ন।

যখন আমরা বলি চন্দ্রের প্রকাশ, তখন আমরা এইটুকু মানিয়া লই যে চন্দ্র বলিয়া একটা কিছু আমাদের নিকট অপ্রকাশ থাকিতে পারে, এবং সেইজন্যই প্রকাশ পাওয়া বলিয়া একটি ক্রিয়াত্মক ব্যাপার (process) এবং তৎপরে চন্দ্রের প্রকাশ অবস্থা এইরূপ মানিতে বাধ্য হই। আসল কথা এই যে, আমি ও চন্দ্র এই দুইটি একান্ত ভিন্ন সত্তা মানিয়া লই বলিয়াই একটি প্রকাশ ব্যাপারও (process) মানিতে বাধ্য হই। কিন্তু শিল্পীর দেশকালাতীত অবস্থায় প্রকাশ বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র ব্যাপার হইতেই পারে না।

তত্ত্বতঃ, প্রকাশের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নাই, উহা একটি অনন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ ও স্বপ্রকাশ। কিন্তু কালপ্রবাহের মাঝে পড়িয়া খণ্ড-আমরা ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের একটা মায়া সৃজন করিয়াছি। আমরা আমাদের খণ্ডতার বশে যাহা কিছু দেখি, তাহাকেই দুটি ভাগে ভাগ না করিয়া পারি না; আমরা কিছুই সমগ্রভাবে দেখিতে পারি না। কারণ যে অদ্বয় অনুভবের মধ্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, সেই অদ্বয় অনুভবের অবস্থাচ্যুত হইয়া যুক্তির চোখে যাহা দেখি, তাহাই আমার বাহির বলিয়া, আমা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া তাহার এক পিঠ দেখি আর এক পিঠ দেখি না—তাহার 'এখন' দেখি, 'তখন' দেখি না। কিন্তু যুক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, "যে পিঠ দেখ না তাহা যে আছে, তাহার প্রমাণ কি?" যুক্তি হয়রান হইয়া যায়—উত্তর দিতে পারে না, অথচ অনুভবের মধ্যে সেই পিঠটিও রহিয়াছে বলিয়া, অনুভব সমগ্রকে জানে বলিয়া তাহাকে অস্বীকারও সে করিতে পারে না। অনুভবের অনির্ব্বচনীয় সত্যকে যুক্তি আসিয়া ভাঙিয়া

ফেলে, আর তখনই নানা ভূলের স্থত্রপাত হয়। এই যুক্তির ভূমিতে নামিলেই দেখি একদিকে আত্মা, অন্যদিকে শরীর, একদিকে ভাব, অন্যদিকে তাহার প্রকাশরূপ।

(১২)

যুক্তির ভূমিতে নামিয়াই বস্তুসত্তা (thing-in-itself) এবং প্রতীতি (appearance), দ্রব্য ও আকার, ভাব ও প্রকাশ, এই সব কথা বলা চলে। এইখানে দাঁড়াইয়াই কবি গাহিয়াছেন—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

বাক্ ও অর্থের, রূপ ও ভাবের নিত্য সম্বন্ধটির কথা বলিতে গিয়া আমরা এই সম্বন্ধের অনির্ব্বচনীয়তাটিকে ঢাকা দিয়া ফেলি। এই সম্বন্ধেরই মধ্যে শিল্পরূপের অনির্ব্বচনীয়তা। ইঁহাকে কেবল ভাব ও রূপের সমষ্টি বা সাধারণ যোগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। ভাবের ও রূপের এই অপরূপ অনির্ব্বচনীয় যোগ লক্ষ্য করিয়াই কি গোটে (Goethe) প্রকৃত শিল্পকে incommensurable বা 'পরিমাণের বাহির' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন?

মূল কথা এই যে, যাহা সত্যই এক তাহাকে দুই করিয়া লইয়া যখন সেই দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হই, তখন তাহা রহস্যময় হইয়া উঠে। রূপ এবং ভাব বলিয়া দুটি স্বতন্ত্র বস্তু অনুভবের মাঝে নাই; তাই যখন ভাব ও রূপের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইয়া তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাই, তখন তাহা অসাধ্য হইয়া পড়ে।

এই জন্যই বেনেদেত্তো ক্রোচেও (Benedetto Croce) বলিয়াছেন যে ভাব (idea) এবং রূপ (expression) ইহারা একই পদার্থ, কারণ রূপ ছাড়া ভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব; যেমন ফুল এবং ফুলের রূপ। যদি কেহ বলে, ফুলের রূপতো দেখিলাম, ফুল বলিয়া যদি ইহা ছাড়া কোনো ভাব থাকে তাহা কি? যুক্তি তাহার বিশেষ কোনো উত্তর দিতে পারে না; বিচার করিয়া যুক্তি পায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতকগুলি বর্ণ ও গন্ধ এবং আরো কিছুর সমষ্টি। কিন্তু অনুভবের মধ্যে ফুল বর্ণও নয়, গন্ধও নয়, বিশেষ কোনো কোমলতাও নয়, সেখানে পাই একটি অখণ্ড রসবস্তু—যাহার নাম ফুল; সেখানে শুধু তথাকথিত রূপই পাইলাম না, তাহার সঙ্গে অখণ্ড করিয়াই পাইলাম একটি রূপাতীতের সন্ধান। তাই যুক্তি প্রমাণ দিতে না পারিয়াও রূপের সঙ্গে তাহার অপ্রত্যক্ষ ভাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে পারে না। অনুভবের ক্ষেত্রে যে শিল্পরূপটিকে, যে রসরূপটিকে পাওয়া যায়, তাহাকেই যদি ক্রোচে intuition বা ভাব নাম দিয়া থাকেন এবং তাহাকেই যদি expression বা রূপ নাম দিয়া থাকেন, তবেই এই দুটি এক বস্তু হইতে পারে, নতুবা যদি যুক্তির ভূমির রূপকে তিনি expression বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে intuition ও expression কিছুতেই এক হইতে পারে না। যেমন, ধরা যাক একটি সঙ্গীত; অনুভবের ক্ষেত্রে এই সঙ্গীত শব্দঝঙ্কার নয়, সুর নয়, কিম্বা তাহার দ্বারা যে ভাব জাগ্রত হয় তাহাও নয়; সঙ্গীত সেখানে একটি অখণ্ড বস্তু; সেখানে ভাব এবং সুর বলিয়া দুটি বস্তুর অস্তিত্বই নাই। কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সঙ্গীতটিকে ভাবে এবং রূপে, রসে এবং সুরে না ভাঙিয়া পারা যায় না; তখন যুক্তি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয় সুরটিকে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সুরের কারুণ্যটিকে কিছুতেই দেখাইতে পারে না। দেহকে দেখান যায়, আত্মাকে কোথায় ধরিয়া দেখাইবে সে?

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যুক্তিদৃষ্টিতে রূপই প্রত্যক্ষ, ভাব যুক্তিপ্রামাণ্য নয়। এই জন্য অনেকে বলিতে পারেন রূপ বা expressionই একমাত্র সত্য বস্তু। সে যা হোক, যুক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রূপ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

(১৩)

রূপের সঙ্গে ভাব জড়িত থাকিতে বাধ্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে ভাবের কথা বাদ দিয়া রূপের আলোচনায় অগ্রসর হইব। রূপটি জ্ঞানসাপেক্ষ, ভাবটি অনুভবলভ্য। অনুভবের অখণ্ডবোধ ছাড়াইয়া আসিলেই জ্ঞানের রাজ্যে আসিয়া পড়ি, সেখানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে। দয়া অনুভব করা এবং দয়া কি তাহা 'জানার' মধ্যে যে পার্থক্য, একখানি ছবি দেখা ও তাহাকে অন্তর দিয়া অনুভব করার যে ভেদ, জ্ঞানে এবং অনুভবেও সেই ভেদ। জ্ঞান বলিতে আমরা এখানে অদ্বয় জ্ঞানের কথা বলিতেছি না। এখানে দ্বৈতাত্মক জ্ঞানই লক্ষ্য। আমাদের এই জ্ঞান বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, সুতরাং রূপটিও এখানে বিশেষভাবে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক। এই রূপকে আমরা দুইভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; এক সুরে—আর এক, চিত্রে। রূপের দুইটি ভঙ্গী আছে—একটি গত্যাত্মক (dynamic), অপরটি স্থিত্যাত্মক (static)। চিত্র হইতেছে ভাবের স্থিতির দিক্, আর সুর হইতেছে তাহার গতির দিক্।

সাধারণতঃ, চিত্র বলিতে আমাদের বর্ণচিত্রেব বা রেখাচিত্রের কথাই মনে জাগে; কারণ ইহাদের মধ্যেই ভাবের স্থিতি-রূপ প্রকট হইয়া উঠে। চিত্র হইতেছে একটি কোনো মুহূর্ত্তের রূপ, সুতরাং ইহার মধ্যে গতি থাকিতে পারে না, গতির একটা ইঙ্গিত মাত্র কখনো কখনো থাকিতে পারে। এই জন্য চিত্র আমাদের দৃষ্টিকে স্থির করে—একটি নিমেষের

নিশ্চলতার মধ্যে। ভাস্কর্য্যেও তাহাই। শব্দের মাঝ দিয়াও এই স্থিতিশীল ভাবের চিত্র আমাদের গোচর করা যাইতে পারে।

নামবাচক শব্দের মধ্যেও গতি নাই। ইহাও স্থিতিকেই প্রকাশ করে। নামবাচক শব্দ স্থিতিশীল ; নাম বস্তুটিই গতিকে, পরিবর্ত্তনকে স্তব্ধ করিবার জন্য। রাম বলিলেই যে ভাবটি জাগিয়া উঠে, তাহা মোটেই রামের পরিবর্ত্তনময় চঞ্চল রূপটিকে প্রকাশ করে না ; রাম নামই রামকে একটি অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব দান করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, শব্দের নিজস্ব ধর্ম্ম গতি নয়, স্থিতি। এই জন্যই শব্দচিত্র সম্ভব।

(১৪)

কিন্তু ভাষা জিনিষটা কেবল কতকগুলি নামবাচক শব্দ নয় ; তাহার মধ্যে ক্রিয়াবাচক শব্দ আসিয়া যখন কতকগুলি শব্দকে একত্র গ্রথিত করিয়া দেয়, তখন বাক্যের মধ্যে আমরা কেবল শব্দসমষ্টি পাই না, তাহার মধ্যে আর একটি জিনিষ পাই, তাহা গতিবেগ ; ক্রিয়াপদের সহায়তায় শব্দরাশি তাহাদের স্থিতিশীল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বায়স্কোপে দৃশ্যমান গতি যেমন কতকগুলি স্থিতিশীল চিত্রে গতি যোজনার ফল, তেমনি ভাষার মধ্যে এই যে গতি, ইহাও স্থিতিশীল শব্দের সহিত ক্রিয়াবাচক শব্দ-যোজনার ফল।

সুরের মধ্যেই আমরা গতিরূপটিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। যে ভাব আমাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া তোলে, তাহার রূপের মাঝে চিত্রের স্থৈর্য্য থাকিতে পারে না, তাহার মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে গতি আসিয়া যোগ দিবেই। যে ভাব আমাদিগকে আনন্দের মধ্যে নাচাইয়া তোলে, তাহার প্রকাশের মধ্যে গতি চাই, তাহা নাটকেই হোক আর কাব্যেই হোক, সঙ্গীতেই হোক, নৃত্যে কিম্বা উপন্যাসেই হোক।

জীবনের ধর্ম্মই গতি। সেইজন্য জীবনের প্রকাশ যেখানে, সেখানেও গতি থাকিবেই। চিত্র জীবনের রূপ নয়, জীবনের একটা আংশিক দৃশ্য মাত্র। সেই জন্য চিত্র অপেক্ষা নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদি আমাদিগকে সহজেই জাগ্রত করিয়া তোলে, সহজেই চিত্তকে দোলা দেয়। এই যে সুর, ইহার প্রকাশভেদে নাম ভিন্ন হইয়া থাকে, সঙ্গীতে উহা রাগিণী, নৃত্যে উহা গতিচ্ছন্দ, বাদ্যে উহা তাল, নাটকে উহাই নাটকীয়তা, কাব্যে উহাই ছন্দ।

ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য

উপন্যাস পড়িতে গিয়া যে প্রশ্নটি বহুবার উঠিয়াছে ও যাহা লইয়া আজিও বাক্ বিতণ্ডার শেষ হইল না, তাহারই একটু আলোচনা করিবার জন্য এই অবতারণা। ঔপন্যাসিককে নিজের কথায় লক্ষ্য প্রচার করিতে ক্বচিৎ দেখা যায়, আর যদিও বা করিয়া থাকেন, সেই সব উক্তির মধ্যেও যথেষ্ট মতের অমিল দেখা যায়। সেই জন্যই ঔপন্যাসিকের কি যে বাস্তবিক উদ্দেশ্য তাহা বোঝা হয় না, আরও দশ জন আসিয়া সেই বোঝাটাকে আরও ভার করিয়া তোলেন মাত্র।

এই অবস্থায় ঔপন্যাসিক টীকাটিপ্পনীতে একটী বেশ উত্তর দিয়া পাঠকবর্গকে তৃপ্ত না হোক নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "চিত্ররচনা করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং যদি আমার বিচার করিতে হয় চিত্রের সুসঙ্গতি, স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি দেখিয়া সেই বিচার কর; ইহা হইতে যদি কোনো সুবিধা বা কুশিক্ষা আদায় করিবার থাকে, সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়। ঔপন্যাসিকের যাহা উদ্দেশ্য, তাঁহার রচনার শিল্পত্বেই তাহা পর্য্যবসিত, অন্য কোনও বাহ্য উদ্দেশ্যের সার্থকতা তাঁহার চক্ষে মূল্যহীন।"

এক কথায় আসল কথাটাকে বিপর্য্যস্ত করিতে হইলে এইরূপ উত্তর বেশ ভালই মানায় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নের তাহাতে কোন কিনারা হয় না। ফলকে জন্ম দেওয়াই গাছের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিলেই যদি গাছের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বলা হইত, তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু এই কথা জানা আছে ভোক্তার সহিত ফলের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটি যদি না থাকিত, তাহা হইলে ফলের অনেকখানি অস্তিত্বই ব্যর্থ

হইয়া যাইত। এই জন্যই ফলটিকে সৃষ্টি করার মধ্যেই গাছের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইয়া যাইতেছে বলিলে অনেকখানি কথাই বাকী থাকিয়া যায়। এই জন্যই আংশিকভাবে উপন্যাসের উপরোক্ত উদ্দেশ্য কতকটা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, কথাটা শেষ হইয়া গেল বলিয়া চোক বুজিয়া আরাম উপভোগ করিবারও উপায় নাই। স্বীকার করি ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য, জীবনের কোনও বিশেষ অবস্থার আনুকূল্যে ও বিশেষ ঘটনার সঙ্ঘাতে মানবপ্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান, মানব চরিত্রের একটা বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি প্রস্ফুট করিয়া তোলা, কিন্তু ইহা ত উপায় মাত্র। এই চিত্ররচনার সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর ঔপন্যাসিক না দিতে পারেন, তথাপি ইহার উত্তর যে পাইতে হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একজন শিল্পী ডাকিয়া বলিলেন, "এই সহস্রধাস্ফুরিত বিচিত্র মানবজীবনের প্রকাশটি আমার নিকট একটি অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তু। আমি দেখিতেছি জীবন একটা পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি, ইহা কখনও সামঞ্জস্যে সম্পূর্ণ হইয়া একটি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও শতধা বিখণ্ডিত হইয়া প্রলয়ের উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, ভালোমন্দের রেশমী সূতার সংমিশ্রণে একটি অপরূপ চিত্র প্রকট হইতেছে; ইহার এক অধ্যায়ে দেখিতেছি ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা, অপর অধ্যায়ে তেমনই স্পষ্ট দেখিতেছি পাপের প্রবলতা ও বিজয়-আস্ফালন। স্রষ্টার দৃষ্টিতে এই ভাঙ্গাগড়া উভয়ই আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাল বলিয়া কোথাও স্রষ্টার তুলিকায় উজ্জ্বলতর বর্ণপাত যেমন দেখিনা, মন্দ বলিয়া তাহাতে আবার তেমনি বর্ণপাতের কার্পণ্যও দেখিতে পাইনা। এইজন্য স্রষ্টারই মত ভালমন্দ নিরপেক্ষ হইয়া সুখদুঃখকে দুপাশে সরাইয়া দিয়া কেবলমাত্র সৃষ্টিরই পরম আনন্দকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়া

আমি এই মানবজীবনের যথাযথ চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি, এবং পাঠকও যাহাতে এমনি নিরপেক্ষ হইয়া এই বিস্ময়কর সৃষ্টির অপূর্ব্ব আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন আমি তাহার চেষ্টা করি।”

উত্তর দিতে না দিতেই কিন্তু সমাজধর্ম্মী নৈতিক মানবটির নাসিকা অনেকটাই কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—“মানুষ যে কেবল দ্রষ্টাও নয়, স্রষ্টাও নয়, এই কথাটা কেন যে আমরা ভুলিয়া যাই, তা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মানুষ যে কেবলমাত্র দেখিবার অনন্ত স্বাধীনতা লইয়া আসে নাই, তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? মানুষ যে পথিক মাত্র, তাহার পথ চলা যে কত বাধা-বিঘ্নে কণ্টকিত, এই পথ চলিতে যে তাহার কতখানি সংযমশিক্ষার প্রয়োজন, তাহাও কি সন্দেহের বিষয়? যাহা কিছু ভাল লাগে তাহার চর্চ্চা করিতে গেলেই যে তাহার সমূহ বিপদ, এ কথা আমাদের ভুলিলে ত চলিবে না। এই জন্যই যাহা কিছু সৃষ্টি করিবার, দেখাইবার ও দেখিবার অধিকার কাহারও নাই। মানুষ যেরূপ দেখে সেরূপ ভাবিতে বাধ্য হয় এবং সেইভাবে ভাবিত হইলে সেইরূপ ভাবানুযায়ী কর্ম্মও করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার স্বাধীনতা বিধাতা তাহাকে দেন নাই ইহা যখন সত্য, তখন যাহা ইচ্ছা ভাবিবার ও দেখিবারও স্বাধীনতা দেন নাই ইহাও সত্য স্বীকার করিতে হইবে। অতি সতর্ক পদক্ষেপে এক খণ্ড দড়ির উপর ভর দিয়া তাহাকে খরস্রোতা পার হইয়া কৈলাসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ অবস্থায় যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার প্রেরণা আসিলে ও করিলে ত তাহার সর্ব্বনাশ। এই ভাল লাগা যে মানবকে কত বড় গভীর বিপন্নতার মধ্যে লইয়া যায় তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই। এই জন্যই বলিতেছি যে মানুষকে নৈতিক হইতে হইবে,

যাহা সৎ, যাহা মঙ্গল, তাহার সাধনা তাহাকে নিবিষ্টমনে করিতে হইবে। সাধনার যাহা অনুকূল, জীবনের পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহাই যে বরণীয়, আর তা-ছাড়া সবই যে বিষবৎ পরিত্যাজ্য, শত মোহনতা, মধুরতা আসিলেও যে তাহা তাহার প্রাণনাশক, তাহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে? এই জন্যই আপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাহা সৎ, যাহা নৈতিক আদর্শের অনুযায়ী, তাহাকে মোহন মধুর করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করা। তাহা না করিয়া শুধু ভাল লাগার নাম করিয়া পতঙ্গের সম্মুখে দীপশিখাকে সুন্দর করিয়া স্বাভাবিক করিয়া আঁকিয়া তোলা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

"জানি অনেকে বলিয়া থাকেন, পাপের চিত্র আঁকিয়া তাহার বিষময় পরিণাম দেখাইয়া চিত্তকে উন্নত করা যায়। যদিও ইহাতে শিল্পীর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, তথাপি ইহাকেও আমি পাপ-প্রশ্রয়েরই ছলনা মাত্র না বলিয়া পারিনা। কারণ, পাপের পরিণাম দেখাইতে গিয়া ইঁহারা প্রথম পাপের মোহনতা দেখাইতে বাধ্য হন। পাঠকের চিত্ত ইহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারে না। আর, একবার যখন চিত্ত পাপের দৃশ্য ও ভাবে মুগ্ধই হইল, তখন পরিণামদর্শনের কি কোনও প্রভাব হইতে পারে? ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ইহার একটি নিদর্শন। মোট কথা, গল্প গল্পই থাকিয়া যায়, অথচ পাপের চিত্র মানবচিত্তকে তদ্বিষয়ে ভাবিবার একটা প্রকাণ্ড অবসর মাত্র আনিয়া দেয়।

"তার চেয়ে আমার মতে ঔপন্যাসিকের উচিত শুধুই আদর্শ চিত্র, আদর্শ জীবন, আদর্শ কর্ম্মকে অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধানত করিয়া তোলা। অনেকে বলিতে পারেন আদর্শচিত্র আঁকিতে হইলেওত contrast বা বৈপরীত্যের প্রয়োজন। ব্ল্যাক বোর্ড যদি কাল না হইত, খড়ির আঁকা ছবি যে শুভ্র, এ কথাটা বোঝা দূরের কথা, ছবি

আঁকাই সম্ভব হইত না। কোনও চিত্রকে ফুটাইতে হইলে তাহার পাশে একটি বিপরীত চিত্রও দাঁড় করাইতে হয়, এইজন্যই রোহিণীর পাশে ভ্রমর, ওথেলোর পাশে আয়াগো, বিলাসের পাশে নরেন। কিন্তু আমি বলি এইরূপ বিপরীত চিত্রেব অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। আমাদের স্ব স্ব মানসিক অবস্থাই আদর্শ চিত্রের বৈপরীত্যের (contrast এর) স্থান পরিপূর্ণ করিবে। আদর্শ চিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করাইবার জন্য ভ্রমরের পাশে রোহিণী না থাকিলেও চলিত; নরেনের হৃদয়ের সরল মহত্ত্ব বিলাস না থাকিলেও স্পষ্টই বোঝা যায়। আদর্শ চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাপচিত্রের প্রয়োজন নাই।”

যাঁহাকে এতক্ষণ নৈতিক মানব এই সব কথা শুনাইতেছিলেন, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “দেখুন যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য, চক্রান্ত করিয়া পাকে চক্রে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, একথা আর যেই মানুক আপনি নিশ্চয়ই মানেন না। অথচ দেখুন তিনি ত আমাদের চক্ষুকে শুধু প্রলোভনপ্রিয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সম্মুখে আবার যথেষ্ট প্রলোভনও ধরিয়া রাখিয়াছেন দেখিতে পাই। ইহাতে ত এমন মনে হয় না যে, বিধাতার ইচ্ছা এই যে মানুষ তাহার চোখে সাতপাক কাপড় জড়াইয়া কোন রকমে এক দৌড়ে এই সংসারটা পার হইয়া যাক। তার চেয়ে আমরা যাহাতে দেখি, সেইজন্যই ত তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাই। যদি এক দৌড়ে মাঠ পার হওয়াই সংসারের পরীক্ষা-পাশের উপায় হয়, তাহা হইলে বিশ্বস্রষ্টাকে মানবের শত্রু না বলিয়া পারা যায় না, নতুবা বলিতে হয় বিশ্বস্রষ্টা একটি পরম বোকা। আমার কিন্তু মনে হয় তিনি বোকাও নন, শত্রুও নন। মানুষকে প্রলোভনের মাঝ দিয়া বহু দুঃখদহন সহ্য করিয়া, বহু আঘাতে নিদারুণ শিক্ষা লইয়া, তবে এই সংসারের পথ চলিতে হয়। যদি সংসারের

কোনও সুসঙ্গত শান্তিময় পরিপূর্ণতার লক্ষ্য থাকে, তবে তাহাকে এই সংসারের করুণ শিক্ষালয়ে পূর্ণশিক্ষা লইয়াই সেই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে; সে শিক্ষা সাতপাক কাপড়ের অন্ধ সংযমে হইবার নয়। এই সাধনার পথে চলিবার অধিকার প্রতিপদে অতি নিদারুণ বেদনা বিনিময়ে অর্জ্জন করিতে হয়। এজন্য আমি চাই এই চিত্তজগতকে অতি উজ্জ্বল করিয়া তাহার ভালমন্দকে এতটুকুও বাদ না দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে। আমি জানি এ জগতে ভাল ও মন্দের সমান দর; স্রষ্টা উভয়কেই একটি কোনও শাশ্বত প্রয়োজনের খাতিরে সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদনা এখানে আনন্দের মূল্য, পাপ এখানে পুণ্যের পথ, অকল্যাণ কল্যাণের আয়োজন। সেই জন্য আমি চরিত্র সৃজন করিতে কাল্পনিক 'কেবল ভাল' আঁকিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে ও আশীর্ব্বাদভাজন হইতে পারি না। আমি যাহা সৃষ্টি করি তাহার মাঝ দিয়া জগৎকে আমি সত্য করিয়া দেখাই। বলিতে পারেন তাহা হইলে আর তোমার সৃষ্টির কি প্রয়োজন, জগৎ-প্রকৃতি দেখিলেই ত হয়। না, তাহা হয় না। বহুকাল হইল একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছিলেন, "কাব্যজগৎ এই জড়জীবজগতের সার—এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক। কাব্য-শোধিত সংসার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। কাব্যে যে তীব্রতা আছে, যে উপকারিতা আছে, সংসারে তাহা নাই। কেন-না সংসার যদি গোলাপঝারি হয়, তবে আমরা বলিব কাব্য আতর। আবার সংসার যদি দ্রাবক হয়, কাব্য মহাদ্রাবক।" * সংসারে ও উপন্যাসে চিত্রিত সংসারে অনেক প্রভেদ। সংসারে জীবনের বিকাশ ব্যাপার এত জটিল, এত গোপন ও ধীর গতিতে চলিতে থাকে যে প্রায়শঃই তাহার পারম্পর্য্য ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলা ধরা

* বান্ধব, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১২৮৩—নাটক প্রবন্ধ।

অসম্ভব হইয়া পড়ে ; সুতরাং দেখার কোনই সার্থকতা থাকে না। মানব এই সংসারে নিজেও কর্ম্মী, নিজেও নানা ভাবের তরঙ্গে তাড়িত, এখানে তাহার দেখার অখণ্ড অবসর নাই, দেখিতে গিয়া এখানে সে নিজেও কর্ম্ম-জড়িত হইয়া পড়ে। দেখিতে হইলে বস্তুটি যেমন অত্যন্ত জটিলতাময় না হইলেই তাহার ধারণা সহজ হয়, তেমনি আবার দ্রষ্টাকেও কতকটা ব্যবধানে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। বস্তু যদি চোখের সহিত লাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে কিছুই দেখা সম্ভব হইত না। বস্তু ও চোখের মধ্যকার ব্যবধানটাও দেখার একটা প্রধান সহায়ক। উপন্যাসজগৎ এই ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া এই দেখাটিকে সহজ সুগম করিয়া তোলে। আরও একটি কথা আছে।

"জীবনের এই বাস্তবচিত্র স্বভাবতঃই করুণরসাত্মক হইয়া থাকে। এই জন্যই অনেকে বিয়োগান্তক সৃষ্টিকে আমল দিতে চাহেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা হইলে কি যাহা সত্য তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে কাল্পনিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখানই শিল্পীর সাধনা হইবে? অতীন্দ্রিয় জগতের কথা জানিনা, সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাস্তব জগতের যাহা সত্য, তাহার দিকে চাহিয়া, বাস্তব জীবনের ঘটনাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া, আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিবার মত মনোভাব যে হয় না, তাহা সত্য। পাপপুণ্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, তাহার সহিত সুখদুঃখের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ এই দুটো চোকে ত দেখা যায় না। তাই আমি দেখিলাম এই জীবন বড় করুণ, মানবভাগ্য বেদনাময়, অশ্রুময়,—বিশ্বশক্তিপুঞ্জের অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। এই সত্যের দিকে চাহিয়া অতি বড় পাপীকেও আর ঘৃণাভরে ঠেলিয়া দিতে পারা যায় না ; কিরণময়ী পাপিষ্ঠা, কিন্তু করুণাবিগলিত মমতা অনুভব না করিয়া, অসহায় শিশুকে যেমন করিয়া মা বুকে টানিয়া লন তেমনি তাহাকেও বুকে তুলিয়া না লইয়া ঘৃণা করিবার মত অমানুষিক হৃদয়হীনতা কাহার আছে আমি জানি না। বিশ্বের মাঝে

নিয়তির এই রহস্যময় লীলা দেখিয়া কি আর মানবকে তাহার কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্য দায়ী করিয়া তাহাকে অপরাধী করিতে মন সরে? মানবের পরম অসহায়তার দিকে যাহার চক্ষু পড়িয়াছে, সে কি আর ভালকে ভাল বলিয়া হাসিতে পারে, না মন্দকে মন্দ বলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিতে পারে? অসহায় মানবের দিকে চাহিয়া এই যে করুণায় হৃদয় গলিয়া যায়, ইহা কি কোনও অংশে নৈতিক শিক্ষা অপেক্ষা হীন, এবং ইহাই কি জীবনের চরম শিক্ষা নয়? পাপীকে সরাইয়া রাখিয়া যে বিশ্বকে দেখিতে চায় দেখুক, আমি কিন্তু মানবকে পাপপুণ্যের সংঘাতের মধ্যেই দেখিতে চাই; এই বাস্তব-সৃষ্টিই আমার লক্ষ্য।"

ভাববাদী ঔপন্যাসিক ইতিমধ্যে পাশে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আপনি একটি কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে এই আমার আমিটিও রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখিয়াছেন, কিন্তু আমিও যে স্রষ্টার আর একটি স্বতন্ত্র এবং বিশ্ব হইতে ভিন্ন রকমের বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা আপনি অস্বীকার করিতেছেন। স্রষ্টা এই জগৎটিকে সম্পূর্ণ যাহা হওয়া উচিত তাহা করিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই, অনন্ত কালের পথ বাহিয়া এই জগৎ চলিয়াছে। আজিও এ জগৎ পরিপূর্ণতা ধরিতে পারে নাই, হয় ত কখনও পারিবেও না। এ জগৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনার অপরিপূর্ণতাকে প্রচারিত করিতেছে ও পরিপূর্ণতার অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে মাত্র। ইহা হইতেই আপনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, মানব-জীবনও এমনি অপরিপূর্ণ। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিতে ও আমাতে যে স্রষ্টার ইচ্ছাবৈচিত্র্য আছে, আপনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এ জগতের আর সমস্ত বস্তুতে ও আমাতে এইটুকু বিশেষ ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে যে, অন্য সমস্ত বস্তু তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের একটা প্রকাশ মাত্র, কিন্তু আমাতে স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রবণতাটুকুও আসিয়া পড়িয়াছে। আমার মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তিও

রহিয়াছে। সমস্ত অসম্পূর্ণতার মধ্যে থাকিয়াও আমার মধ্যে তাহাকে ছাড়াইয়া যাওয়ার শক্তি-সম্ভাব্যতা রহিয়াছে। তাই এ জগৎ যে-পরিপূর্ণতার দিকে কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, আমার বিচিত্র মন আপনার ধ্যানালোকে কল্পলোকে সেই পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই জন্যই বাস্তব-সৃষ্টির নাম দিয়া মানব-অন্তরের বিরাট সম্ভাব্যতাকে আপনি যখন অস্বীকার করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ও অসহায় করিয়া দেখাইয়া বসেন, তখন আমি কিছুতেই তাহাকে সত্যকার বাস্তব-সৃষ্টি বলিতে পারি না।

"অপরিপূর্ণতার বন্ধনে এই যে সৃষ্টি কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তাহার এই বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি নাই, শুধু আমার আমিটি এই প্রয়োজনের চক্রপেষণ হইতে, সীমার বদ্ধতা হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া পরিপূর্ণ আনন্দলোকে উপনীত হইতে পারে। যদিও মানব বন্ধনের বেদনায় কাতর, তথাপি তাহার মধ্যে মুক্তির একটা দিক্ রহিয়াছে। শত বন্ধনের দংশনে পীড়িত এই মানবজীবনের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া জানি না অনন্ত আকাশের কোন্ নক্ষত্রলোকের বার্ত্তা লইয়া কোন্ পরিচয়ের স্মৃতি বহন করিয়া উদাস দক্ষিণা হাওয়া কখনও কখনও আসিয়া মানবচিত্তে কি আলোড়ন তুলিয়া দেয়, অমনি মুহূর্ত্তে যত বন্ধন, যত দীনতা, যত বদ্ধতা, সব কোথায় ঝরা পাতার মত উড়িয়া যায়; মানব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করে। তখন যেন আমার মধ্যে এ কোন্ আমির লীলা অনুভব করি, আমি যেন স্রষ্টার সহিত এক হইয়া যাই, কোথায় যেন ভেদ থাকে না। সেই মুক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আর কিছুতেই এই তথাকথিত বাস্তব-সৃষ্টিকে সত্য সৃষ্টি বলিয়া সমাদর করিতে পারি না।"

বাস্তববাদী বলিলেন, "আপনি যে-নক্ষত্রলোকের বার্ত্তার কথা বলিতেছেন উহা বাস্তব জীবনের সত্য নয়, উহাকে আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা অনুভব করি।"

ভাববাদী উত্তর করিলেন, "আপনার একথার উত্তরও পূর্ব্বেই দিয়াছি। আপনি শুধু বিশ্বকেই দেখিতেছেন, আমার মন বলিয়া যে-বস্তুটি তাহাকে আপনি ভাল করিয়া দেখিতেছেন না। আমার মন যখন আপনার বাস্তব সত্যকে ছাড়াইয়াও অন্য সত্যের সন্ধান পায়, তখন আমিও যেমন ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, আপনিও তেমনি ইহাকে সত্যের মর্য্যাদা না দিয়া পারেন না। এই মাত্র বলিতে পারেন যে, আমার কল্পনা আপনার সীমাবদ্ধ বাস্তবতাকে পার হইয়া গিয়াছে। ইহাকে অসত্য বলিবার আপনার কোন যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই।"

নৈতিক মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ভাববাদী মহাশয় নীতিশাস্ত্রের কথাটা উল্লেখ পর্য্যন্ত করিলেন না। একটু অধীর হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনিও কি বলিতে চান যে নৈতিক উদ্দেশ্য থাকার কোনও প্রয়োজন নাই?"

উত্তর হইল, "দেখুন আমি ত তাহা বলি নাই, তবে একথা বলিব যে নৈতিক জগৎটাও বন্ধনের জগৎ, পথ চলাটাও নিয়মের বন্ধন। তবে এই পথ চলা প্রয়োজন হইতে পারে, হইতে পারে যে ইহার প্রয়োজন আছে। কারণ, নৈতিক সাধনারও লক্ষ্য হইবে পরিপূর্ণতার দিকে, স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, নৈতিক সাধনার মধ্যেও প্রকৃত আনন্দ নাই। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি এই নৈতিক সাধনার বাঁধা-বাঁধির মধ্যে স্বাধীনতা পায় না, আনন্দ পায় না। এই জগৎকে পরিপূর্ণ করিয়া দেখার ও জানার যে আনন্দ আছে, নৈতিক সাধনা তাহা দিতে পারে না। অথচ মানুষের মধ্যে যে একটি মুক্তির প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা ক্রমাগত তাহাকে সকল আবরণ মুক্ত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে, সকল বন্ধন, সকল সীমাকে উপেক্ষা করিবার জন্য প্রেরণা দিতেছে। অথচ মানবের স্বাভাবিক সংস্কারগত যে বদ্ধতা তাহা তাহাকে কিছুতেই

ওই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে দেয় না। বদ্ধতা আছে বলিয়াই সে নিয়মকে অতিক্রম করিতে গেলে নানা অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হয়। মানুষের এই দুই মুখী গতি—এক বদ্ধতার দিকে, অপর মুক্তির দিকে—তাহাকে টানাটানি করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, মানবের মধ্যে এই মুক্ত-আমি ও বদ্ধ-আমির বিরোধ রহিয়াছে বলিয়াই আমার সহিত আপনার মিল কিছুতেই আর হইয়া উঠিতেছে না।

"মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? যতক্ষণ আপনার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, এই মুক্ত-আমি ও বদ্ধ-আমির বিরোধ না মিটিতেছে, ততক্ষণ কিছুতেই একটা স্থির মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শুধু ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়াও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

"মানবাত্মা যখন অকস্মাৎ আপনার মধ্যে আপনাকে মুক্ত বলিয়া দেখিতে পায়, তখন সে দ্রষ্টার মত বলে, আমি এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির কণামাত্রও আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে দিতে পারি না। বিস্মিত কৌতূহলভরে আমি শুধু দেখিব—আমার নিকট ভাল নাই, মন্দ নাই—আমি জানি একমাত্র আশ্চর্য্যকে, বিস্ময়ময় রহস্যময়কে। তাহার দিকে চহিয়া দেখিতে আমার কণামাত্র সঙ্কোচ নাই, ইহাতেই আমার পরম আনন্দ।

"কিন্তু এই পরিপূর্ণ আনন্দবোধ জীবনে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে চায় না। মুক্তির দিকটি বন্ধ হইয়া যায়। বাসনাচঞ্চল বদ্ধ-আমির চাঞ্চল্যে এই পরিপূর্ণ আনন্দ বিকৃত হইয়া পড়ে; পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার অনাবিল সৌন্দর্য্য মেঘান্ধকারে মলিন হইয়া যায়, বেদনায় চিত্ত পীড়িত হয়, আবার ভাল মন্দের আবর্ত্তে পড়িয়া চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। বদ্ধ-আমিটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার যতই পক্ষপাতী হোক না কেন, তাহার পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা যে সুখময় নয়, চরণ যে তাহার শৃঙ্খলিত, চলার পথ যে তাহার

সীমাবদ্ধ, ইহা অতি কঠোর সত্য। মুক্ত-আমির অধিকারের দিকে লুব্ধ হস্ত বাড়াইতে গিয়া বদ্ধ-আমিকে বার বার মর্ম্মান্তিক জ্বালা লইয়া ফিরিতে হয়।

"এই জন্যই আমাদের বদ্ধ স্বভাবটি মুক্ত-আমির প্রলোভনে পীড়িত হইয়া বলে 'ওগো আমায় আর তুমি এ প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিও না।' মানবের মধ্যে মুক্তি ও বন্ধনের এই বিবাদের অবসান না হইলে, তাহার এ দ্বন্দ, এ অশান্তি কিছুতেই মিটিবে বলিয়া মনে হয় না। নীতিবিদ্ বদ্ধ-আমিকে শাসন করিতে থাকিবেন, ঔপন্যাসিক শিল্পী মুক্ত-আমিকে লইয়া বিহার করিবেন, আর মাঝে হইতে আমার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চিরকালই চলিতে থাকিবে। এই দুটি আমিকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিবার কোনও উপায় যদি থাকে তাহার সন্ধান করুন, নতুবা ভুল করিয়া আপনি আমার সম্পত্তি লইয়া টানিবেন আর আমি আপনার সৃষ্টিকে লইয়া হয়ত টানাটানি করিতে থাকিব। কারণ, বাস্তবিক পক্ষে আপনার যাহাকে লইয়া কারবার আমার কারবার তাহাকে লইয়া নয়।"

ট্র্যাজিডির কথা

(১)

মানবজীবনে একটা নিদারুণ অক্ষমতা, অসহায়তা ও ভ্রান্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে। নানা বিচিত্র অবস্থার পাকে চক্রেই হোক, অথবা চরিত্রগত বৈচিত্র্যের জন্যই হোক, জীবনের এই দুঃসহ দুঃখের দিক্‌টি যখন ফুটিয়া উঠে, তখনই জীবন ট্র্যাজিডিতে পরিণত হইয়া থাকে। প্রতি মানবের জীবনেই এই ভীষণ দুঃখের একটি সম্ভাব্যতা রহিয়াছে, এই জন্যই অপরের দুঃখের সহিত আমার দুঃখের একটা যোগ রহিয়াছে; অপরের জীবনে এই অবস্থাগত অথবা চরিত্রগত অসহায়তা যখন প্রকটিত দেখিতে পাই, তখন কোথায় যেন আপনার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত অসহায়তা অনুভব করিয়া আমাদের চিত্তও ব্যথিত হইয়া উঠে। বর্ব্বর জাতির করুণগাথা হইতে আরম্ভ করিয়া সুসভ্য জাতির করুণ শিল্পসৃষ্টি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ট্র্যাজিডির এই সাধর্ম্ম্য দেখিতে পাই; সর্ব্বত্রই ট্র্যাজিডির মূলগত অনুভব হইতেছে জীবনের একটি নিদারুণ, অনতিক্রম্য দুঃখ।

যাহার জীবনে এই দুঃখের দুঃসহ প্রকাশ ঘটে, তাহার নিকট উহা মোটেই কোন আনন্দবস্তুর উপাদান নহে; কিন্তু যিনি এই করুণ সৃষ্টির স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, তাঁহার নিকট এই দুঃখ যে একটি আনন্দবস্তুর উপাদান তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দুঃখের কাব্য আমরা যতটা সুখে পাঠ করি, হাল্কা হাসির মধ্যে আমরা তেমন আনন্দ পাই না; যে হাসির অন্তরে একটি অন্তঃসলিলা অশ্রুর প্রবাহ আমরা অনুভব করি না, সে হাসির দাম আমাদের নিকট খুবই সামান্য। সে যাই হোক্, ট্র্যাজিডি যে একটি

আনন্দবস্তু তাহাই এখানে বলিতে চাই। ট্র্যাজিডির প্রাণ হইতেছে নিদারুণ দুঃখ। মনোবিকাশের তারতম্য অনুসারে—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে—এই দুঃখের আবার উপাদানগত ভেদ যথেষ্টই আসিয়া পড়ে। আমারও যেমন অতি তীব্র দুঃখ বোধ রহিয়াছে, তেমনি একজন নিগ্রোরও দুঃখ বোধ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে। কিন্তু তাহার ও আমার মনোজগৎ স্বতন্ত্র প্রকৃতির বলিয়াই সে যাহাতে দুঃখ পায়, আমি হয়ত তাহাতে মোটেই দুঃখ পাই না।

(২)

বিড়াল মরিলে আমার বিশেষ কোন দুঃখ না হইতে পারে, কিন্তু কাহারও মনে যদি ওই মৃত্যুতে পুত্রশোকের উদয় হয়, তাহা হইলে আমার তাহাকে মিথ্যা বলিবার কোনই ভিত্তি থাকিতে পারে না। Silas Marner এর টাকার শোক যে দিন হইয়াছিল, সে দিনকার সেই শোক যে কত সত্য, কত গভীর, তাহা যিনি তাহাকে ওই নিস্তব্ধ রাত্রিতে "My ducats" বলিয়া প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছেন, তিনি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে Silas Marner তাহার স্নেহের পাত্রীর জন্য সমস্ত অর্থই ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই অর্থ-বিচ্ছেদে তাহার কোনই বিচ্ছেদের যাতনা হইল না। সেই জন্যই যদি কেহ বলেন Silas Marner এর প্রথমকার দুঃখটা ছিল অলীক এবং অবাস্তব, তবে সেই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিবেই।

অর্থাৎ ওই যে ঠাকুরমার চারিপাশে নাতিনাতনীরা তন্ময় হইয়া উপকথার কত সুখদুঃখে বিভোর হইয়া আছে, তাহাদের বুকের মধ্যে ওই যে দ্রুত স্পন্দন হইতেছে, তাহা কোন অলীক দুঃখে নহে। শিশুর

মনোজগতে উপকথার রাজপুত্র, রাক্ষসখোক্কস ও রাজকন্যার মত সত্য আর কিছুই নাই। শিশুর জগতের মাঝেও একটা নিয়ম আছে, যে কোন মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া শিশুকে বলিলে তাহাতে শিশুর আনন্দ নাই, শিশুকে আনন্দ দিতে হইলে শিশুর বাস্তব জগৎটি লইয়া রসসৃষ্টি করিতে হইবে। শিল্পে সত্য-মিথ্যা বিচারের সময় এই কথাটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

(৩)

সে যাহোক, ট্র্যাজিডির কথায় ফিরিয়া আসা যাক্। মানব জীবনে দুঃখ একটি অতি প্রবল সত্য। নিত্যকাল হইতে মানুষ এই দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথটি বাহিয়া চলিয়া আসিতেছে। জীবনের এই ক্ষুদ্র দীপালোক ঘিরিয়া অনন্ত অমানিশার সুগভীর অন্ধকার স্তব্ধ হইয়া আছে, ইহাকে মানুষ অস্বীকার করিতে পারে নাই; ওপারে হয়ত আলোয় আলোময়, কিন্তু এ জগৎসংসারের মধ্যে মানবাত্মার অবস্থা যে "A child crying in the night" এর (অমানিশায় ক্রন্দমান শিশুর) মত তাহা একটি অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা। তাই জগতের মর্ম্মস্থল হইতে প্রতিনিয়ত একটি বড় সকরুণ ক্রন্দন উঠিয়া মোক্ষকামী বুদ্ধের কারুণ্যময় দৃষ্টিকে নিত্যকালের জন্য এই চির অসহায় বিশ্বের দিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই দুঃখের গানের শেষ হইল না, তাহার তীব্রতার হ্রাস হইল না—মর্ম্মতলে কোথায় যেন অনন্ত দুঃখের অশ্রু-উৎস অবরুদ্ধ হইয়া আছে। তাই দুঃখসঙ্গীত এমন করিয়া মানবের গভীর চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলে।

চিরকাল শিল্পী, মানবের এই দুঃখের দিক্, এই অসহায়তার দিক্ দেখাইয়া আসিতেছেন; ইহার মধ্যে কোন আশাভরসা ও সান্ত্বনার

আলোক দেখা যায় নাই। মানবের এই অসহায়তা দেখাইয়া মানবকে হীন প্রমাণিত করা তা-বলিয়া শিল্পীর উদ্দেশ্য নহে; কোনও সত্যকে প্রকাশ করার মধ্যে হীনতা নাই। মানব-প্রকৃতি পরিপূর্ণতার আসন নহে। যদিও মানবের অন্তরে এই পরিপূর্ণতার দিকে একটি প্রেরণা রহিয়াছে ইহা সত্য, তথাপি এই চেষ্টাই মানবকে চিরকালের জন্য সেই আদিম রহস্যের কাছে অসহায় শিশুর মত করিয়া রাখিয়াছে। মানবের মধ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের চেষ্টা আছে, কিন্তু তাহার পরিপূর্ণতার কোনও সম্ভাবনা 'ট্র্যাজিক' শিল্পীর চক্ষে ফুটিয়া উঠে নাই। রহস্যময় অদৃষ্ট বিধাতা মানবকে কেমন করিয়া কোথায় যে চালনা করিতেছেন, তাহা মানবজ্ঞান আজও বলিতে পারিল না। মানবের মধ্যে একটি মঙ্গলাভিমুখী ইচ্ছা রহিয়াছে—কিন্তু তাহার বিপরীতেরও কোন অভাব নাই—আর, বিধাতাপুরুষ যে কোন্ খেয়ালের বশে কখন কি ভাবে মশ্‌গুল্ হইয়া জীবনের খেলা খেলেন, তাহাও কেহই জানে না। মানবজীবন যেন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রাত্রির বুকে কম্পমান দীপশিখামাত্র—অদৃষ্ট ইচ্ছার নিকট সে একটি ক্রীড়নক মাত্র, ইহাই 'ট্র্যাজিক' (tragic) শিল্পীর মনোভাব।

(৪)

Divine Comedyর কথাটা বাদ দিয়াই এই জীবনের আলোচনা করা উচিত মনে করি। কারণ, এই মানবজীবন আর যাহাই হোক, স্বর্গীয় শান্তিনিকেতন নয়। ইহার প্রতি কেন্দ্রে দুঃখেরই তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। তবে জীবনের সবটাই যে আমাদের নিকট ট্র্যাজিডি নয়, মর্ম্মান্তিক দুঃখের বোঝা নয়, ইহা স্বীকার্য্য। এই যে অমানিশার অনন্ত অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া বিশ্বকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, ইহার মাঝেও কি

আলোক-দ্বীপ নাই ? ইহার মাঝেও ক্ষুদ্র দীপালোককে কোটি চন্দ্রালোক মানিয়া যুবক তাহার প্রিয়তমাকে, শিশু তাহার মাতাকে বিস্ময়ে আনন্দে মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছে, নিমেষের তরে হইলেও রোমান্সের আলোকে সে এই জীবনের চির-অসম্ভব প্রার্থিতকে সম্ভব করিয়া লইয়া দেখিতেছে।

কিন্তু এই যে 'কমিডি', এই যে আনন্দ ও শান্তি, এই যে দর্শন ও প্রাপ্তি, ইহা শুধুই স্বপনের দেখা। এই দেখা পরিপূর্ণ সত্যবোধের ফল নয়, ইহা মানবকে পথের বিশ্রাম দিতে পারে, এবং এই হিসাবে ইহার মূল্যও অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু ইহা কখনও ঘরের বিরাম, পূজারীর মন্দির প্রবেশের তৃপ্তিময় প্রশান্তি দিতে পারে না। সাধারণ জীবনের এই যে কমিডি ইহা যে-কোনও মুহূর্তে মানব চেতনার গভীরতর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই ট্র্যাজিডি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। অনুভবদৃষ্টির একটু গভীরতা ও জ্ঞানের কিঞ্চিৎ প্রসার মানবজীবনের তথাকথিত শান্তির অবসান ঘটাইয়া দেয়।

(৫)

এই অবসানের একটি সত্য কারণ রহিয়াছে। প্রতি মানবের মধ্যেই অনন্তবোধ সুপ্ত রহিয়াছে—মানবাত্মার গতি ভূমার দিকে, সম্ভাবনা তাহার অনন্ত। এই জন্য ক্ষণিকের বিশ্রাম দিলেও কোনও সুখেই তাহার পিপাসার চরম নিবৃত্তি নাই। থাকিয়া থাকিয়া অন্তরের সেই অনন্তবোধ এক বিরাট অস্বস্তির রূপ ধরিয়া সকল সুখকে ঝড়ের মুখে ছাড়িয়া দিয়া হা হা করিয়া উঠিতে চায়। এই জন্যই দুঃখমাত্রের মধ্যেই আমরা আমাদের নিত্যকালের দুঃখের স্পর্শ পাই, আভাস পাই। সুখের মধ্যে আমাদের আত্ম-বোধের বিস্মৃতি ঘটে, দুঃখের মধ্যে তাহার জাগরণ হয়। যাহা আছে

তাহার মোহ আমাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে; কিন্তু দুঃখবোধ, বেদনা-বোধ, কি-যেন-নাই-বোধ আমাদের অভাববোধকে অসীম করিয়া আত্মবোধের পরোক্ষানুভূতি দিয়া থাকে।

এই দুঃখবোধের পরম নিবৃত্তি কোথাও কখনও হয় কিনা তাহা লইয়া শিল্পীর সহিত তর্ক নিষ্প্রয়োজন। অপূর্ণতাই যে-জীবনের সংজ্ঞা, তাহার পক্ষে এই দুঃখবোধ যে জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ, এবং দুঃখের মধ্যেই যে জীবনের সত্যরূপটি সমধিক পরিস্ফুট, ট্র্যাজিক শিল্পীর নিকট এইটিই হইতেছে কাজের কথা।

(৬)

জীবনের এই নিগূঢ় দুঃখের পরিচয় আমাদের চাই; দুঃখের সহিত সত্যকার পরিচয় না হইলে আমার সহিতই আমার পরিচয় বাকি থাকিয়া যায়। এই পরিচয়টি আধাআধি হইলে চলিবে না। আধাআধি করিয়া, ভাগাভাগি করিয়া মানুষ কোন বস্তুকেই চায় না, সে পাওয়ায় মানুষের কোন তৃপ্তি নাই। সত্যকার চাওয়ার মধ্যে একটা সুতীব্র নিবিড় ঐকান্তিকতা রহিয়াছে, এই নিবিড় ঐকান্তিকতার মধ্যেই দুঃখের সত্য পরিচয়—চিনিঢাকা কুইনাইনের বড়ির মধ্যে কুইনাইনের সত্য পরিচয় নাই, উহার মধ্যে শুধু মানবের ভীরুতার ও দৌর্ব্বল্যের পরিচয়টিই অঙ্কিত হইয়া আছে।

অথচ মানুষ কিন্তু দুঃখকে ভয় পায় না মোটেই। দুঃখের দিকে মানুষের মধ্যে একটা নিদারুণ আকর্ষণ রহিয়াছে, কোথাও কোথাও তাহার প্রকাশও আমরা দেখিতে পাই। গ্রীক ট্র্যাজিডির জন্মকালটাই ইহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়। * গ্রীক জীবনের, গ্রীক সভ্যতার

---

* *cf. Nietzsche's Birth of Tragedy.*

পূর্ণ বিকাশের দিনই তাহার ট্র্যাজিডি রচনার যুগ দেখিতে পাই। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজিডির জন্মকালও ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি দুঃখময় অধ্যায় ত নহেই, বরং তাহাই ছিল তাহার জীবনের বসন্তকাল। দুঃখের যুগে কোথায় করুণ কাব্যের জন্ম হইবে, তাহা না হইয়া, জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশের মুহূর্ত্তেই এই যে মানব চেতনায় ট্র্যাজিডির আবির্ভাব, ইহার মূলে ওই কথাটিই নাই কি ?

এই দুঃখের মধ্য দিয়া সে তাহার আপনার পরিচয়টির সন্ধান করে ও সাক্ষাৎ পায় বলিয়াই দুঃখকে তাহার ভয় নাই। শুধু গ্রীক বলিয়া নহে, প্রতি জাতির, প্রতি মানবের সত্যকার পরিচয়টি তাহার সমৃদ্ধির আনন্দে নয়, তাহার দুঃখের বিপুলতায় ও গভীরতায়। সেখানেই বুঝিতে পারি যে, তাহার অভাব কত বড়—অর্থাৎ সে কত বড় হইতে চায়, কত বৃহৎ সফলতার দিকে তাহার চিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে, কোন্ অভাবের যাতনায় সে নিজেকে নিদারুণ দুঃখী বলিয়া মরিয়া যাইতে চায়।

(৭)

আসল কথা, মানুষ হইতেছে জীবনের উপাসক। সুখে হোক, দুঃখে হোক, জীবনের বিপুলতাই সন্ধানের বস্তু। অল্পে তাহার সুখ নাই। চরম দুঃখের আঘাতে ব্যক্তির বিলয় এই বিশ্বব্যাপারে কোন একটা অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। ব্যক্তির এই বিনাশের মধ্য দিয়া জীবন-ব্যাপারের অপরিসীম দুর্জ্ঞেয়তা ও তাহার রহস্যের বিপুলতা আমাদিগকে বিস্মিত করে, স্তব্ধ করে; যে সত্যকে কতকটা চোক বুজিয়া না দেখিয়া আরাম করি, সে আরাম নির্ম্মূল করিয়া দিয়া আমাদিগকে সচকিত ও বিহ্বল করে এবং ব্যক্তি হইতেও বৃহত্তর অদৃষ্টরহস্যের সত্তার দিকে ইঙ্গিত করে।

ইহাতে ব্যক্তির হীনতা প্রমাণ হয় না,—তাহার করুণ দৈন্য চোকে পড়ে, জীবনের দিকে কারুণ্যদৃষ্টি জাগ্রত হয়। ট্র্যাজিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানবের প্রতি অশ্রদ্ধাবুদ্ধিকে জাগ্রত করা নয়, মানবজীবনের মধ্যে যে পরম কারুণ্য রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করা। Sophocles এবং Dostoieffskyর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে আমরা ট্র্যাজিডির এই সার্থকতা দেখিতে পাই।

(৮)

মানব আপনার জীবনে এক অনন্ত বৈচিত্র্যের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, অথচ এই পরম রহস্যের অপরিসীম অজ্ঞেয়তাই তাহার পথটিকে চিরকালের জন্য অনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই অনিশ্চয়তাই ট্র্যাজিডিকে চিরন্তন সম্ভাব্যতায় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে এবং জীবনরহস্যের অনন্ত বৈচিত্র্যই তাহাকে নিত্যনূতন রূপে দেখা দেওয়ার শক্তি দিয়াছে। মানবজীবনের দুঃখের এই চিরবিচিত্রতাকে ভাল করিয়া না দেখিলে ট্র্যাজিডির সত্য পরিচয়টিই বাকি থাকিয়া যায়।

আদিমকাল হইতে যে একটি সত্য জীবনের ট্র্যাজিডিকে মানুষের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, তাহার নাম মৃত্যু। একেবারে এক-নিমিষে মানুষ এক অতি নিগূঢ় রহস্যের সুভীষণ স্তব্ধতার মধ্যে আপনার অসহায় চিত্তকে প্রত্যক্ষ করে, যখন হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহার সম্মুখে আবৃত মুখে দাঁড়ায়। বিহ্বল মানব কিছুতেই বুঝিতে পারে না, কোথা হইতে কে আসিয়া চোকের পলকে জীবনের মর্ম্মগ্রন্থি কাটিয়া দিয়া এত বড়, এত বিচিত্র বিশ্বোৎসবটিকে চকিতের মত মিথ্যা স্বপ্নে পরিণত করে। আদিম মানবের অপরিণত মনও এই নিদারুণ আকস্মিকতার মধ্যে রহস্যময়

অদৃষ্টশক্তি (Fate)র সরোষ আঘাত অনুভব করিয়াছিল এবং তার পর দেখিয়াছিল যে শুধু মৃত্যুর মধ্যে নয়, নানা অজানিত দুর্ঘটনা ও বিপদের মুখে মানুষকে ফেলিয়া দিয়া নৃশংসলীলা করাই যেন সেই অদৃষ্ট দেবতার একমাত্র কর্ম্ম। * জীবনের সেই সব অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে সেদিন মানুষ কোন কর্ম্মফলের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম দেখিতে পায় নাই; কোন একটি দুর্জ্ঞেয় শক্তির নৃশংস খামখেয়ালীর ফল মানবজীবনকে প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত করিতেছিল; ভয়ের মধ্য দিয়া সেদিন রহস্যের পরিচয় সংঘটিত হইয়াছিল।

(৯)

তার পর, এই অদৃষ্টশক্তির অবারিত রহস্যময় গতির প্রবল তাড়নার মুখেও মানব আপনার মধ্যে একটি শক্তি লাভ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। মানব আপনার অন্তরে একটি নৈতিক আদর্শের প্রেরণা গোড়া হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে কল্যাণের আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে বিশ্বশক্তিকেও কল্যাণ-মুখী বলিয়া জানিয়াছিল। এইজন্য গ্রীকট্র্যাজিডির মধ্যে সর্ব্বত্রই এই কল্যাণবোধের জীবন্ত প্রভাব দেখিতে পাই। দেবাধিপতি Zeus যে কল্যাণকে এখানে না হইলেও পরলোকে, এখনই না হইলেও কখনও না কখনও—জয়যুক্ত ও আনন্দাভিষিক্ত করিবেন, এই প্রবল বিশ্বাসের ফলেই ট্র্যাজিক চরিত্রগুলিকে পরমদুঃখ বরণ করিয়া লইতে দেখিতে পাই।

মানবজীবনে এই ধর্ম্মবোধ জাগরণের ফলে জগৎ হইতে ট্র্যাজিডি তিরোহিত হইল না, একটী অপূর্ব্ব রূপান্তর হইল মাত্র। অদৃষ্টের অভিশাপ

* The words of Solon in Herodotus I. 32. '*God is envious and loves confusion.*'

মানবজীবনকে মুক্তি দিল না, কিন্তু অন্তরের ন্যায়বোধ মানবকে ট্র্যাজিডির মধ্যেও, অসহায়তার মধ্যেও, গৌরববোধ দান করিল। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে গিয়াই চরমদুঃখের সম্মুখীন হইতে তাহার বেদনায় অন্ত রহিল না সত্য, কিন্তু এই বিশ্বাস তাহাকে গৌরব দিল যে, বিশ্বলোকাধিপতির সর্ব্বদর্শী দৃষ্টির সম্মুখে তাহার এই মহত্ব উপেক্ষিত হইবে না।

নীতি এবং ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াও মানব দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইল না, কিন্তু অন্তরের হীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মার মহান্ গৌরব অনুভব করিল। এই জন্য য়্যান্টিগোণ (Antigone) ও রামায়ণ অতি করুণ কাব্য হইলেও, জীবনের অতি নিদারুণ ট্র্যাজিক চিত্র হইলেও, তাহার মধ্যে মানবাত্মার অপূর্ব্ব জয় রহিয়াছে—মানবজীবন এইখানে Divine Comedy হইল না সত্য, কিন্তু Divine Tragedy অমর ট্র্যাজিডি হইয়া দাঁড়াইল।

(১০)

বর্ত্তমান ইউরোপের দিকে চাহিয়া আমরা কিন্তু ট্র্যাজিডির একটি স্বতন্ত্র রূপবিকাশের ক্ষেত্রে উপনীত হই। গ্রীক ট্র্যাজিডির পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আমরা একটি জীবন্ত ধর্ম্মবোধের প্রাবল্য দেখিতে পাই; নিমেষে নিমেষে চেতনায় আসিয়া এই কথাটিই আঘাত দেয় যে, যাহাই কর না, লোকপালক, দেবাধিপতি Zeusএর ন্যায়দৃষ্টির কঠোর শাসন এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব।

> "His thought 'mid Fate's mysterious night
> A growing blaze against the wind
> Prevails :—whatever the nations say,
> His purpose holds its darkling way."
>
> —*Æschylus*

ইউরোপের চিত্ত কিন্তু জীবনের দিকে চাহিয়া গ্রীকের সেই ধর্ম্ম-বোধে প্রবুদ্ধ হইতে পারে নাই এবং কোনও অদৃষ্টের প্রচণ্ড প্রভাবকে জীবনে স্বীকার করিতে চায় নাই। সেই জন্য সেক্সপীয়রীয় * ট্র্যাজিডির দিকে চাহিয়া আমরা তাহার মূলে কোনও অদৃষ্টশক্তির লীলাকেই বড় করিয়া এবং একমাত্র সত্য করিয়া দেখিতে পাই না। যদিও ট্র্যাজিডিমাত্রেরই মূলে কতকটা বিশ্বরহস্যের অজ্ঞেয়তা ফুটিতে বাধ্য এবং সেই জন্যই যদিও সেক্সপীয়রীয় নাটকেও কোথাও না কোথাও একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার ও শক্তির বেগ এবং প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি মুখ্যতঃ সেক্সপীয়র দেখাইতে চাহিয়াছেন, ট্র্যাজিডির মূলে মানবচরিত্রেরই অপূর্ণতা রহিয়াছে।

সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডির কারণ মুখ্যতঃ মানবচরিত্রেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব—অথবা একটি মানুষের সহিত পারিপার্শ্বিক নৈতিক শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের মাঝে দৈবশক্তির অদৃষ্ট ক্রিয়া না দেখিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। মানবচরিত্র-বস্তুটাই এখানে অদৃষ্টরহস্যের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মানবচরিত্রও সত্যই একটা বিপুল রহস্য—তাহার অন্তরে কত আশা, কত ভয়, কত ভাবনার ঠেলাঠেলি; কত ইচ্ছা, বিচিত্র প্রবৃত্তি, কত হিংসা, দ্বেষ, ভালবাসার সংগ্রাম সেখানে অবিরাম কুরুক্ষেত্রের সত্যতা প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে। মানবের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কখন যে কোন্‌টি প্রবল হইয়া উঠিবে, কখন যে তাহাকে কোন্ সর্ব্ব-নাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তাই নাই।

* সেক্সপীয়রীয় বলিতে একটু ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে। সেক্সপীয়রীয় নাটকের মধ্যে যে ট্র্যাজিডির সূত্র পাওয়া যায়, যে কোন শিল্পে তাহা পাওয়া যাইবে, তাহাকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশেষ পরিবেষ্টনের উপরই বহুপরিমাণে তাহার শুভাশুভ নির্ভর করে।

এই সংঘর্ষ কেবল যে কোনও একটি মানবচিত্তনিহিত বিচিত্র সংস্কার-রাশির মধ্যেই তাহা নয়, এ সংগ্রাম ব্যক্তির সহিত বিশ্বের, বাস্তবের সহিত আদর্শের, চিত্তের নিম্নবৃত্তির সহিত উচ্চবৃত্তির, কর্ম্মের সহিত কর্ম্মের সত্য উদ্দেশ্যের। যেমন মানবের নিজের মধ্যে, তেমনি একের সহিত অপর মানবের—প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির, শ্রেয়ের সহিত প্রেয়ের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিতে পারে, এবং তাহারই ফলে মানবীয় দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানের সকরুণ ট্র্যাজিডি ফুটিয়া উঠিতে পারে।

এই ট্র্যাজিডির ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। কোন বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রগত অসামঞ্জস্য যে শুধু তাহার জীবনকে সকরুণ বিফলতার শ্মশানে শেষ করিয়া দেয় তাহা নয়, মানবের সমষ্টিগত সংস্কার ও দুর্ব্বলতার পরিণাম সকল বিশ্বকেই বহন করিতে হয়। একটি সমাজের ও জাতির দুর্ব্বলতা যেমন কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবনকে অকারণে দলিত করিতে পারে, তেমনি একটি বিশেষ মানবের কর্ম্মফল হয়ত তেমনি ভাবে একটি সমাজ এবং জাতিকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজিডিও এই সত্যটি অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। একটি ব্যক্তির অপরাধে তাহার বংশের উপর দেবতার অভিশাপ আসিয়া পড়িত—আমাদের পুরাণ-ইতিহাসও ইহার সমর্থন করিয়াছে, দেখিতে পাই। সমস্ত বিশ্বের সহিত ব্যক্তিবিশেষের যোগ এত নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ বলিয়াই এবং সমগ্র বিশ্বের সামঞ্জস্য এখনও একটি অতিমাত্রায় কাল্পনিক সম্ভাব্যতা বলিয়াই মানবজীবন যে কখনও ট্র্যাজিডিবিহীন অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে, এই আশা করা বাতুলতা বলিয়া মনে হয়।

মরলোকাধিবাসীর এই পথটি কোন্ পরিপূর্ণ আনন্দলোকের দ্বারদেশে আপনার ক্লান্ত শ্রান্ত রেখাটি টানিয়া পৌঁছাইতে পারিয়াছে, সে খবর নাকি পাওয়ার কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পরিপূর্ণ আনন্দ নাকি মানবচেতনার শেষের শেষ কথা—ক্ষীরের পুতুল নাকি ক্ষীর সমুদ্রে গিয়া লীন হইয়া যায়, তাই সে দেশের বার্ত্তা আজও পর্য্যন্ত কেহই লইয়া আসিতে পারেন নাই। সে যা-হোক, মানুষ যতটুকু পথের সন্ধান জানে ততটুকু যে একটা সংগ্রামের পথ এবং অনিশ্চিত রহস্যাভিসারের পথ, তাহাতে বিশেষ কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।

এ পথের প্রত্যেকটি ধূলিকণা কোটি কোটি মানবের নিদারুণ নিষ্ফলতার ক্রন্দন বুকে চাপিয়া, সহস্র কোটি মানবের হৃদয়রক্ত মাখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে।

(১১)

সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডি কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ মানবচেতনার অনন্তবোধের ফল নয়—এই ট্র্যাজিডি মানবজীবনের একটা অতি পরিচিত ক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ; যাঁহার চক্ষে শুধু এই ট্র্যাজিডিই ধরা পড়িয়াছে, তিনি যে জীবনের খুব বেশী গভীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বলা চলে না। ইহার মধ্যে একই ভাবের অনন্তবোধ মাত্র দেখা যাইতে পারে। যখন সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বলতাগুলি সংসারের সুখশান্তিকে নিমেষে নিষ্পেষিত করিয়া যায়, তখন মানবচিত্তে সুপ্ত অনন্তবোধ মূঢ়বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠে! দুর্ব্বলতাই—হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতিই এই জাতীয় ট্র্যাজিডির কারণ। সাংসারিক সাধারণ জীবনক্ষেত্রে ইহারাই ট্র্যাজিডির

বিকাশে সহায়তা করে সত্য, কিন্তু উচ্চতর ও গভীরতর ট্র্যাজিডির বিকাশ ইহাদের দ্বারা হয় না। সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডি জীবনের সেই উচ্চতর লোকের কোন সন্ধান দিতে পারে নাই।

ইবসেনের Brand, গেটের Faust, ব্রাউনিংএর Paracelsus জীবনের যে ট্র্যাজিডিকে আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়াছে, তাহার মূলে জীবন সম্বন্ধে একটি নবীন অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; এই ট্র্যাজিডির মধ্যে মানবাত্মার যে সম্ভাব্যতার চিত্র পাই, সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডির মধ্যে তাহা কিছু পাই না।

(১২)

অবশ্য দার্শনিকের মত কথা বলিতে হইলে বলা চলে যে, দুঃখমাত্রই প্রতিহত কামনার ফল, সুতরাং শক্তিহীনতা বা দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। এইভাবে কথা বলিতে গেলে জীবনের সর্ব্বপ্রকার ট্র্যাজিডির মূলেই এক দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হয় এবং তাহার অর্থকে একটু ব্যাপক করিয়া বুঝিতে হয়। এই দুর্ব্বলতার অর্থ মানবাত্মার মৌলিক শক্তিহীনতা অর্থাৎ মানবাত্মা যে ভগবান্ নয়, ইহাই তাহার মৌলিক দুর্ব্বলতা; যত কিছু ট্র্যাজিডি, সকলেরই মূলে এই দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার প্রচণ্ড আঘাতের কথা বাদ দিয়া আমরা যে সব মানবীয় দুঃখের কল্পনা করিয়া থাকি, সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডি তাহার মূলে যে-দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা এই মৌলিক দুর্ব্বলতা নহে। চিত্তকে একটু উন্নত করিলে, চিত্ত একটু পবিত্র হইলে, এই সব সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বলতা হ্রাস হইয়া আসে, এবং ইহার ফলে এই সব দুর্ব্বলতাজনিত ট্র্যাজিডিও আর থাকে না।

কিন্তু তাই বলিয়া এই সব দুর্ব্বলতার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব-জগৎ হইতে ট্র্যাজিডি অন্তর্হিত হইবে, এমন কথা একটুও বলা চলে না। মানবচিত্তের প্রসার ও লীলাক্ষেত্র সংসারের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া বহু দূরদূরান্তর ব্যাপ্ত হইয়া আছে; সেই বিশাল চেতনার ক্ষেত্রে মানব আপনার জীবনের যে যোগ, যে সামঞ্জস্যকে স্থাপন করিতে প্রয়াসী, তাহা কোন স্বার্থের টানে নয়, সেটি একটি নিগূঢ় পরিচয়ের বেদনাময় আকর্ষণে।

দৌর্ব্বল্যজনিত অসহায়তাবোধ মানবচিত্তের একটা সত্য অবস্থা হইলেও, উহা নিম্নস্তরেরই কথা। এই সব দুর্ব্বলতা কাটিয়া আসিতে থাকিলে মানবাত্মার সত্যকার ও নিত্যকার ট্র্যাজিডি (The Tragical in Daily Life) জীবনে ধরা পড়িতে থাকে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ও বিশ্বের সাংসারিক অভাবের, প্রয়োজন ও স্বার্থময় টানের সম্পর্ক বাদ দিলেই অন্তরাত্মার যে একটি রহস্যময় পরিচয়তৃষ্ণা জাগ্রত হয়, তাহারই মধ্যে মানব আপনার বিশালতর সত্তা ও গভীরতর জীবনকে পাইতে আরম্ভ করে। এখানেই মানব-অন্তরের গভীর রহস্যব্যাকুলতা ও অনন্ত-বোধের বেদনা এক অপরূপ ট্র্যাজিডির জন্ম দেয়।

(১৩)

মানবের অন্তরাত্মা সুদূর কল্পলোকের যাত্রী—সেই দিকেই সে চলিয়াছে; এই বিশ্বলোককে ব্যাপ্ত করিয়া, ঘিরিয়া, অতিক্রম করিয়া যে কল্পলোক বিরাজ করে, তাহাকে কেহ বলে স্বপ্নলোক, কেহ বলে উহা স্বপ্নলোকও নহে, কল্পলোকও নহে, উহাই সত্যলোক, কারণ মানব-অন্তরের গভীরতর সত্যের রূপটিই হইতেছে এই কল্পলোকের বস্তু। সাধারণ মানুষ যে ইহাকে স্বপ্নলোক বলিতে চায় ইহার একটা হেতু আছে। সাধারণ মানুষ আপনাকে

সংসারের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াই দেখে ও জানে ; এইজন্য মানবের যে সব আশা ও স্বপ্নপ্রায় কল্পনা এই সংসারের বাহিরে কোথাও সার্থকতা খুঁজিতে যায়, তাহাকে সংসারের মানুষটি স্বপ্ন বা কল্পনা ছাড়া কিছুই মনে করিতে পারে না। অথচ সংসারের বাহির হইতে স্বপ্নলোকের আহ্বান যাহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার নিকট সেই কল্পলোক ভিন্ন বাকিটা সবই মায়ালোক। কবে, কোথায় যে সে এই লোকাতীত স্বপ্নলোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল তাহা সে জানে না, কিন্তু তাহার অন্তরের সুনিশ্চিত বিশ্বাস কেবলই তাহাকে যেন কোথায় লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল, ইহলোকের সত্য তাহার নিকট একটা প্রহেলিকার মায়া, একটা ভ্রান্তির আবরণমাত্র মনে হয়।

সেই স্বপ্নলোকে প্রতি মানবের একটি প্রচ্ছন্ন জীবন (cf. M. Arnold's *Buried Life*) চলিতেছে। সংসারিক প্রয়োজন ও সুখদুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া, আকস্মিক ঘটনার বিক্ষোভমুক্ত হইয়া যখন অন্তর আপনার নিভৃত নিরালায় ফিরিয়া আসে, তখন ওই তারার এতটুকু ঝিকিমিকি, নিশান্ধকারে মৃদুস্নিগ্ধবায়ুবাহিত শেফালির সুগন্ধরাশি, একখানি হঠাৎ-দেখা মুখের স্মৃতি, একটি নিমেষের নীরব করসংস্পর্শ তাহার চেতনাকে সেই স্বপ্নলোকে জাগাইয়া তুলে ; গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবিধৌত ধরণীর শ্যামসৌন্দর্য্যের মত নিস্তব্ধ গম্ভীর কি এক বিশাল মাধুর্য্য যেন বড় সকরুণ ব্যথায় চিত্তকে আচ্ছন্ন, মগ্ন করিয়া ফেলে। বহির্জ্জীবন তখন একটা ক্ষণিকের আচ্ছাদনের মত কোথায় মিলাইয়া যায়, যেন মানব কোন অসীম রহস্যের সাক্ষাৎ পায় ; তাহার জীবন যে এক পরমাশ্চর্য্যের ইঙ্গিতে লোকান্তরের দিকে চলিয়াছে, তাহা আধ আধ মনে পড়ে। সেই সুবিপুল রহস্যের লীলা যখন জীবনে প্রত্যক্ষ হয়, তখন মানববুদ্ধির অহমিকা এক নিমেষে কোথায় মিলাইয়া যায়—তখন গভীর কারুণ্যবোধ জাগ্রত হয়।

মানবজীবনের সত্যকার ট্র্যাজেডি এই স্বপ্নলোকের যাত্রী ভিন্ন আর কাহারও গোচর হইতে পারে না। মেটারলিঙ্ক ও রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে এই রহস্যলোকের কতকটা পরিচয় দিয়াছেন; ইহাঁদের নাটকগুলি জীবনের যে বিস্ময়ময় বিকাশক্ষেত্র ও বেদনাকে আমাদের চিত্তের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চায়, তাহা আজও সাধারণ মানবের সহজ অনুভবের সম্পদ্ হয় নাই। আমাদের জীবনের প্রতি নিমেষের চলাফেরায় একটি বিচিত্র ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের অতি সহজ ও প্রত্যক্ষ যে লীলা চলিয়াছে, তাহাকে আমাদের স্থূলতাভ্যস্ত প্রাণ আজও চিনিতে পারে নাই। আজ এই সত্যটিকে আমরা মানিতেই চাই না যে, একটি সন্ধ্যার বিষণ্ণ গম্ভীর সৌন্দর্য্য মানবের অন্তর্লোকে একটি কত গভীর ও করুণ ব্যথার সৃষ্টি করিতে পারে। অন্তর্লোকের সেই ট্র্যাজিডির যুগ এখনও আসে নাই—কিন্তু আসিবে ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, মানব যে আজ সেক্সপীয়রের জগতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সে যে অন্তর্লোকের দিকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার সাক্ষীর অভাব নাই।

স্বপ্ন ও সাহিত্য *

পূর্ব্বকালে স্বপ্নের ফলাফল বিচারের জন্য নাকি বড় বড় শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, আর রাজা রাজড়ারা নাকি অনেক সময় স্বপ্নের ফলাফল শাস্ত্রকারের মুখে শুনিয়া তবে যুদ্ধ করিতে যাইবেন কি না, তাহা স্থির করিতেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনও তেমনি কোনও স্বপ্নের ইঙ্গিত পাইয়াই সপ্তদশ অশ্বারোহীর আগমনে সন্ত্রস্ত হইয়া পশ্চাদ্বারের সন্ধান করিয়াছিলেন কি না, তাহা সঠিক বলিবার উপায় না থাকিলেও, প্রাচীনকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা যে ঘটিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে যাহোক পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা স্বপ্নমাহাত্ম্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মাঝে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা ছিল, তাহা এখানে আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বের সন্ধানীরা স্বপ্ন সম্বন্ধে যে ভাবের সিদ্ধান্ত করিতে চলিয়াছেন তাহারই আভাস দিয়া আমাদের বক্তব্যের দিকে যাত্রা করিব।

মানুষ ঘুমায়; তাহার এ ঘুমটা যে একটা নিতান্ত বিস্ময়াবহ ব্যাপার, সে কথাটা এখানে না হয় খুলিয়া না-ই বলা গেল, কিন্তু ঘুমাইতে গিয়া, সত্য সত্যই অসাড়ে ঘুমাইয়া, মানুষ যে আবার ঠিক জাগ্রতের মতই হাসে, কাঁদে, জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ ও চলাফেরার অভিনয় করে, এমন কি তিন সেকেণ্ডে তিন দিনের যাত্রা শেষ করিয়া আসে, এটা কি আমাদের চিন্তার মধ্যে ক্ষণেকের বিস্ময়কেও বহন করিয়া আনে না? এমন একটা ব্যাপার হয় কেমন করিয়া?

এই "কেমন করিয়া"র জটিল সমস্যাকেও টানিয়া আনিয়া দার্শনিক গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করিয়া বসা বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। তাই দু' কথায়, 'আমরা

* ৺বারাণসী 'বিশ্বনাথ লাইব্রারী'তে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

ঘুমাই কেন’ সে দিকেই সহজ বুদ্ধিকে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিব। যাঁরা ভগবানের বিশেষ কৃপায় হঠাৎ বিশ্বজগৎটাকে মিথ্যা মনে করিয়া তাহার দিকে পৃষ্ঠ দেখান সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তাঁদের কথা এখানে বাদ দেওয়া যাক্। এখানে শুধু আমাদের নিজের কথাই বলিবার চেষ্টা করিব। আমরা সাধারণতঃ নিতান্ত ক্লান্ত না হইয়া পড়িলে এই জগৎটাকে অপছন্দ করি না, ইহা বোধ করি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বিশ্বজগতের লক্ষ বৈচিত্র্য আমাদের মনের লক্ষ তারে কত যে অভিনব স্পন্দন তুলিতে চায়, আর আমাদের মন যে তাহার জন্য কি অসীম ঔৎসুক্য অনুভব করে, তাহার আর অন্ত নাই। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহাও এই বিশ্বজগতের সম্পর্কেই ; চেতনার মাঝ হইতে যদি নিমেষের জন্যও এই জগৎ বাদ পড়ে, তখন আমরা মরার বাড়া হইয়া যাই।

মোট কথা, আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ঘুমাইতে আসি নাই। তবু আমরা ঘুমাই, ঘুমাইতে বাধ্য হই। এই শক্তির জগতে, শক্তির লীলার সঙ্গে সঙ্গে, শক্তির একটা অপচয় আছে। মনের তার নানা সুরে ঝঙ্কার দিয়া বাজিবে বলিয়াই এই তার লাগান হইয়াছে। এই তারগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, তাহাকে অচঞ্চলস্তব্ধ ও ধ্যানস্থ করিয়া, বিধাতার পায়ে ছুঁড়িয়া ফেলাটাকেই আমরা জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করি না। কিন্তু তার বাজিলেই সে ঢিলে হইবে। তাই যন্ত্রের বিরাম চাই, নূতন করিয়া সেতার বাঁধিবার অবসর চাই। ঘুম আমাদের সেই নিভৃত অবসর, যখন দেহ তাহার শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়।

তার সব ঢিলে হইয়া যায়, ছিঁড়িয়াও যায় ; কিন্তু সেতার যে অধীর আগ্রহে কেবলি বাজিতে চায়, তাহার অন্তরের অযুত কামনা যে লক্ষ কোটি গীতে বিশ্বজগতের মাঝে সহস্রভাবে মূর্ত হইয়া উঠিতে চায়। ইন্দ্রিয়েরা ক্লান্ত হইয়া ঘুমের মধ্যে শক্তি আহরণ করিতে চায়, আর মন এদিকে

বাহিরের জগতের দিকে ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। মনকে শাসন করিবার যদি কেউ মনে না থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি বিশ্বজগতের চোকে ঘুম নামিতেই পারিত না। তবে মনের শাসন যেই করুক, তাহাকেও যে ভারতশাসনে বৃটিশের মত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাই মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মধ্যে, আর কখনও কখনও অনিদ্রা রোগের আবির্ভাবের মধ্যে।

যাহোক, তাহা হইলেই দেখিতেছি যে ঘুমের প্রয়োজন হইলেও মন তাহাতে রাজি হয় না। তাহাকে তাই কোনো রকমে শান্ত করিবার জন্যই স্বপ্নের উদ্ভব, ইহাই কি মনে করা ঠিক নয়? মন বহির্জ্জগতেই সত্যকার আনন্দকে পায়, সেখানেই তাহার জীবন। কিন্তু শক্তির অপচয়টাকে পূরণ করিয়া লইবার জন্য, তাহার যন্ত্রটির বিশ্রামও অত্যন্তই প্রয়োজন। তখন মনকে একটু ভোলাইয়া রাখার জন্য, জানিনা আমাদের মনের কোন্ হিতৈষী তাহাকে স্বপ্নরাজ্যের মাঝে ছাড়িয়া দেন; তাহার চাওয়ার কতকটা সফলতা পাইয়া মন কিছুকাল সেখানে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

স্বপ্নের সার্থকতা যে বহির্জ্জগৎ হইতে বিদায়ের মধ্যে নয়, তাহার বাস্তবিক সার্থকতা যে মনকে বহির্জ্জগতে আসিয়া বিকশিত হইবার শক্তিকে সঞ্চয় করার অবসর দেওয়ার মধ্যে, এই কথাটি বোধ করি এখন বলা যাইতে পারে। যদি কোনো মানুষ বহির্জ্জগৎকে বিদায় দিয়া কেবলই নানা উপায়ে স্বপ্নরাজ্যের পথ খুঁজিতে থাকে, তাহা হইলে যে আমরা তাহাকে সুস্থ মানুষ বলিব না, তাহা বোধ করি তর্ক করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অথচ অল্লাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই যে কোনো কোনো সময় বাস্তব জগতের ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া, স্বপ্নের মাঝেই কতকটা মনগড়া তৃপ্তির মোহকে কামনা করি, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায়

নাই। তা যাই হোক, যখন কাহারও মধ্যে বাস্তবজীবনের প্রতি বিমুখতা, আর স্বপ্নজীবনের দিকে উন্মুখতা অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন আমরা তাহাকে যে স্থানে প্রেরণ করিতে চাই তাহার নাম পাগলা গারদ, এটা নিশ্চিত। অবশ্য পূর্ব্বেই আমি বহির্জ্জগৎ হইতে বিগত এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রবিষ্ট কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবানের কথাটা এখানে বাদ দিয়াই রাখিয়াছি, কারণ সে সম্বন্ধে এখানে কিছু না বলাই শোভন ও সমীচীন।

কিন্তু কেন যে আমরা বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নের দিকেই কখনও কখনও বেশী পরিমাণে উন্মুখ হইয়া পড়ি, তাহার একটু আলোচনা করা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন মনের তারগুলি শক্তিহীন হইয়া পড়ে, ঢিলে হইয়া যায়, তখনই মন স্বপ্নের মাঝে তৃপ্তির সন্ধান করে। কিন্তু শুধু তারগুলি ঢিলে হইলেই যে মন বিশ্বজগতের সুরপ্রবাহকে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা নয়; কোনো কোনো মনের তার স্বভাবতঃই এমন দুর্ব্বল যে, ভয় হয়, বিশ্বের রুদ্র সুরে সে তার একেবারে ছিঁড়িয়া না যায়। মনের মাঝে যখন তাহার শক্তির প্রতি এই অবিশ্বাস কোনও না কোন কারণে জাগিয়া উঠে, তখন মন আপনাকে বিশ্বশক্তির সম্মুখীন করিতে ভয় পায়, তখনই তাহার আপনার মধ্যে সে ক্লান্তি অনুভব করে; আপনাকে সে ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভব করে, অযোগ্যতার বোধ জাগ্রত হয়।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকাটা অযোগ্যতার ভয়ানক বিরোধী। তাই প্রাণশক্তি যেমন করিয়া হোক, আপনাকে যোগ্য বলিয়া জানিতে চায়, অনুভব করিতে চায়। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছিল বলিয়া প্রচণ্ড চিন্তাবীর নীট্‌সে 'শক্তির ইচ্ছা' (Will-to-Power) মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, আর তাই বলিয়াছিলেন যে, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেককে আপনার

মধ্যে একটা মায়া সৃষ্টি করিতে হইবে; আপনার শক্তির উপরে বিশ্বাস, এই মায়া। মানুষ প্রতিনিয়ত এই মায়ার শক্তিতেই দাঁড়াইয়া আছে। যখন বাহিরের জগৎ তাহাকে ভ্রূকুটি করে, তখন সে স্বপ্নের জগতে শক্তিমান্ সাজিয়া অযোগ্যতার অভিশাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। পাগলদের মধ্যে আমরা এই মায়ার দ্বারা আত্মরক্ষার দৃষ্টান্তটি খুবই জ্বলজ্বলে দেখিতে পাই—যদিও একটু ভাল করিয়া দেখিলে আমরা আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই কাল্পনিক চরিতার্থতার এই মিথ্যা মায়ালীলা যে না দেখিতে পাই তাহা নয়। বক্তা তাঁর অসহ্য বক্তৃতার যাতনায় শ্রোতাকে ক্লিষ্ট করিলেও, লেখক তাঁহার রচনার একঘেয়ে বকুনির দৈর্ঘ্যে পাঠককে বিরক্ত করিয়া তুলিলেও—(দৃষ্টান্ত হয়ত চোকের সামনেই!)—মনে মনে তাঁহাদের নিজের উক্তি এবং রচনা সম্বন্ধে একটা গৌরববোধ নিশ্চয়ই থাকে। নিজের সম্বন্ধে ওইটুকু মায়াই তাঁহাদের আত্মরক্ষার আবরণ। ওইটুক্ স্বপ্ন বা কল্পনার আড়ালেই দুর্ব্বলকে আত্মরক্ষা করিতে হয়।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, স্বপ্নপ্রয়াণের মূলে সব সময়ই একটা অতৃপ্তি রহিয়াছে; সেটা সাময়িক শক্তির অভাবজনিত হইতে পারে, কিংবা মনের মাঝে বদ্ধমূল অযোগ্যতাবোধের দরুণ হইতে পারে, আবার বাস্তবজগতে প্রকাশপথের বাস্তবিক কিংবা কাল্পনিক অভাবের জন্যও হইতে পারে।

এখন যদি হঠাৎ বলিয়া বসি যে, স্বপ্নপ্রয়াণ মানুষ যে কারণে করে, সাহিত্যপ্রয়াণও ঠিক সেই কারণেই করিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই হাসিয়া উঠিবেন। তাই তাহার পূর্ব্বে সাহিত্য কথাটার একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিব, জানিনা কতদূর উহা সাহিত্যদর্পণের সংজ্ঞার সঙ্গে বনিবে। এই বিশ্বজগতে একটি পরমাশ্চর্য্য বস্তু আছে, যাহার সম্মুখে আমরা

অহোরাত্র রহিয়াছি অথচ আমরা তাহাকে বিশেষ জানিও না, আর সেই কারণেই আশ্চর্য্য বলিয়াও মনে করি না। এই পরমাশ্চর্য্য বস্তুটির নাম ব্যক্তিত্ব (personality)। এই অপরূপ ব্যক্তিত্ব বস্তুটির প্রকাশই যে-রচনার মুখ্য ব্যাপার, তাহাকেই আমি সাহিত্য নাম দিতে চাই, অন্ততঃপক্ষে বর্ত্তমান আলোচনায় সাহিত্য বলিতে পাঠক এইটুকু মনে করিলেই আমার বক্তব্য যথাসম্ভব শেষ হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং আশা করি কাহারও ইহাতে আপত্তি হইবে না। কারণ, সত্য মিথ্যার মাপকাঠি যে সুবিধা, এটা বুদ্ধিমান্ জেম্‌স্ তাঁর Pragmatismএর দ্বারা বহুপূর্ব্বেই বলিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন!

সাহিত্য না বলিয়া শিল্প বলিলে আলোচনা আরো ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইবে, তবে আপাততঃ ঝগড়া বাড়াইবার কোনো প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিত্ব বস্তুটি স্বভাবতঃ বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আপনাকে রূপময় করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেছে; সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই প্রকার চেষ্টা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই সমাজ, সভ্যতা এবং মানুষের নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান কথনও মানব-ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করিয়া অব্যাহত ও অবিকৃত করিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই মানুষ তাহার চেষ্টার অসাফল্যে অধীর হইয়া তাহাকে কেবলই ভাঙ্গিতে চায়, আর যদি ভাঙ্গিবার শক্তি না থাকে তাহা হইলে কল্পনার ক্ষেত্রে তাহার বাঞ্ছিতকে সে সত্য করিয়া লইয়া সাক্ষাৎ করিতে চায়। এই জন্যই বাস্তব জগতের চেয়ে কল্পলোকেই মানুষ তাহার মনটিকে সত্য করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্যই সত্যকার সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার স্থান এত বড়। এই কল্পনা মানুষের মায়িক সৃষ্টির এক রহস্যময় শক্তি; তা বলিয়া এই কল্পনা যাহাকে প্রকাশ করে তাহা কিন্তু মিথ্যা নহে। কারণ কল্পনার প্রকাশের বস্তুটি হইতেছে ব্যক্তিত্ব,—মানুষের অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষাময়

রসান্বেষী মন। মন যখন বাহিরের বিশ্বে আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারে না, তখন সে বাধ্য হইয়া এই কল্পনার অবাধ ক্ষেত্রে আপনাকে ইচ্ছাময় স্বরাট্ করিয়া দেখে, আপনার কাল্পনিক সৃষ্টির মধ্যে আপনার বাস্তব সার্থকতার কামনাকে মূর্ত্ত করিতে চেষ্টা করে ও কতকটা সাফল্যের তৃপ্তিও পাইয়া থাকে। স্বপ্নের মধ্যে মনকে মগ্ন রাখিয়া যেমন ঘুমের মধ্যে মানুষ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে, স্বপ্ন না থাকিলে যেমন ঘুমই সম্ভবতঃ অসম্ভব হইয়া পড়িত, তেমনি সাহিত্যিক কল্পনার ক্ষেত্রে বিশ্বমানব আপনাকে কতকটা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া বাস্তবজগতের বিপুল বাধাময় ক্ষেত্রে চলিবার শক্তিকে অর্জ্জন করিতেছে। যদি মানুষ আপনাকে শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এমন করিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিত, তাহা হইলে এই মানবজাতির বাঁচিয়া থাকাই হয় ত অসম্ভব হইত—সমাজ, সভ্যতা কিছুতেই গড়িয়া ওঠা সম্ভব হইত না। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থাকিলে হয়ত ইহা দেখান যাইত, সাহিত্য স্বপ্নের মতই কেমন করিয়া মানবজাতির নানাবিধ বাসনাকে একদিক দিয়া তাহাকে বাস্তবজগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তিও দিতেছে।

স্বপ্ন মানুষের ঘুমটিকে সহজ করিয়া দিয়া শক্তি সঞ্চয়ের সহায়তা করিতেছে; কিন্তু কেহই যেমন তাহার মাঝে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কামনা করে না, আর যদি বা কেহ বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া কেবল স্বপ্নেরই মাঝে ছাড়া পাইতে চায়, তাহা হইলে যেমন তাহাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে, তেমনি আমার মনে হয় যে, কোনো জাতিই স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার সাহিত্যকেই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া মনে করিতে পারে না, এবং যদি কোন জাতি সাহিত্যের মধ্যে তাহার চরম ও পরম সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সেই জাতিরও মানসিক বিকার ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর এই বিকারের মূলে যে

সব কারণ রহিয়াছে তাহার অপসারণের চেষ্টাই জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

আমাদের বাঙ্গালীর বাস্তবজীবনের সহিত তাহার সাহিত্যের আলোচনা করিলে, বাঙ্গালার বুকে বর্ত্তমান যুগে যে সব শক্তির সাড়া জাগিয়াছে, তাহার সহিত বাঙ্গালীর সত্যকার জীবনের যোগ কোথায়, সে বাস্তবজগতের দিকেই চলিতে উন্মুখ, না, স্বপ্নলোকের দিকেই পলায়ন করিতে উৎসুক, তাহা ধরা পড়িবে। আমার বোধ হয় তেমনই একটা আলোচনার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্য ও বাঙ্গালার জীবনের যোগটি স্বাভাবিক অবস্থায়ই আছে, না, কোনো কারণে তাহা অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বক্তব্যের সীমা পার হইয়া আসিয়াছি, স্বপ্নের সহিত সাহিত্যের সাধর্ম্ম্য কোথায় সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং এইখানেই বিরাম।

সাহিত্যের জাতীয়তা

(১)

সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব—তাঁর চিত্তের স্বাভাবিক সত্তা স্বরূপ, তাঁর মনোময় জীবনের ধারা—তাঁর চিত্রে ও সুরে এবং তাঁর ভাষার ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিছুতেই তাহাকে গোপন রাখা চলে না, ইহা কিছু নূতন কথা নয়। সাহিত্যিক তাঁর চাওয়া-পাওয়া, তাঁর ভালমন্দের অনুভূতি এবং অন্তর্জ্জীবনের সংগ্রাম ও আনন্দকে কখনও বা অনাবৃত ভাবে, কখনও বা ছদ্মবেশে প্রকাশ না করিয়াই পারেন না; কারণ তাঁহার কল্পনা কখনও তাঁহার রাগাত্মিক জীবনের (affective life) ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। এই কারণেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা যেমন একটা সার্ব্বজনীনতা পাই, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরতম ইতিহাসটিকেও লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই জন্যই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিকে একদিক দিয়া সাহিত্যিকগণের অন্তর্জ্জীবনের ইতিহাস বলিয়াও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সাহিত্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে বলিয়াই সাহিত্যের ভাবগত গুণাগুণ সবটাই নির্ভর করে তাঁহার অন্তর্জ্জীবনের, তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের পরিমাণের উপর। সুতরাং বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের ভাবগত মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, আধুনিক সাহিত্যিকগণের জীবন যে-শক্তির ক্ষেত্রে বিকশিত হইতেছে, সেই শক্তির দিগ্‌দর্শন করিতে হইবে।

(২)

আমাদের দেশের বর্ত্তমান জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার মধ্যে দুইটি ভিন্ন ধারা আমাদের চোকে না পড়িয়াই পারে না। আমাদের পল্লী এবং নাগরিক জীবনের দ্বিধারার কথাই বলিতেছি। বিগত শতাব্দীর

মধ্য দিয়া আমাদের পল্লী এবং নগরে একটি বিপুল ভাবগত বিচ্ছেদ দেখা দিয়াছে; তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্যটিই নিরূপণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

প্রথমতঃ, যে দেশে পল্লী এবং নগর উভয়ের মধ্য দিয়া একই সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে দেশে পল্লী এবং নাগরিক জীবনের পার্থক্য কি ভাবের, তাহার একটু আলোচনা প্রয়োজন। নগর সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, নানা কারণে নগরের মধ্যেই দেশের বিদ্যাবুদ্ধি এবং ধনসম্পদের কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পল্লীজীবনকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই এই নাগরিক জীবনের প্রয়োজন। একদিক দিয়া এই নগরকে দেশের ধমনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাগরিক জীবনের মধ্যে দেশের বিদ্যা ও বাণিজ্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং সেখান হইতে তাহা পল্লীর মধ্যে প্রসারিত হইয়া থাকে। যেখানে তাহা হয় না, সেখানেই বিকৃতি ঘটে এবং বিকৃতির ফলে কালে নাগরিক জীবনও আপনার ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে। যদিও ধমনীর মধ্য দিয়াই শরীরের রক্তস্রোত প্রবল হইয়া চলিয়াছে, তবু তাহার আসল কাজ হইতেছে শরীরের আনাচে কানাচে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জীবকোষের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া জীবদেহকে পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত করা; যেখানে ধমনীর সহিত সূক্ষ্মতম জীবকোষের যোগটি বিচ্ছিন্ন, সেখানেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

তেমনি আবার যেখানে পল্লী এবং নগরের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধটি অবিকৃত থাকিবে, সেখানেই নাগরিক জীবন ধমনীর মত সংগৃহীত শক্তিকে পল্লীজীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে সুস্থ ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিবেই। আর এক দিক্ দিয়া নগরকে মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্কের ভালমন্দের বিচার যেমন শুধু তাহার দিকে চাহিয়া করা যাইতে পারে না, দেহের ও মনের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া যেমন আমাদিগকে মস্তিষ্কের ভালমন্দের বিচার করিতে হইবে, তেমনি নাগরিক জীবনের কোনও অবস্থা বাঞ্ছনীয় কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, পল্লীজীবন ঠিক ঠিক পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে কি না; যদি না করে, তাহা হইলে সে দায়িত্ব গৌণতঃ সমগ্র দেশের উপর থাকিলেও মুখ্যভাবে নাগরিক জীবনকেই তাহার দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

(৩)

দেহ কিসে পরিপুষ্ট হইবে, সে কি চায়, কি তাহার প্রয়োজন, তাহার সন্ধান যেমন দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষের প্রয়োজনের মধ্যে, তেমনি কোন জাতির সত্যকার জীবন কোথায়, তাহার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি কিসে, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে, যাইতে হইবে সেই জাতির পল্লীজীবনের মধ্যে। কারণ, পল্লীর জীবনধারার মধ্যেই জাতির বৈশিষ্ট্য, তাহার একান্ত এবং বিশেষ প্রয়োজনের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। তাই বাংলার পরিচয়কে পাইতে হইলে তাহার পল্লীর নিকট যাইতে হইবে, এবং তাহার চিন্তা ও অনুভবের বিশেষ ভঙ্গীটির সন্ধান লইতে হইবে। যদি বাংলাকে তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি বাংলার বিশেষ ভাবুকতার কোনো সার্থকতা এই বিশ্বে থাকে, তাহা হইলে বাংলার নগরকে তাহার কথা ভুলিলে চলিবে না। বাংলার নগর যদি বাংলারই নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে ওই বাংলা-পল্লীর প্রাণের ক্ষুধাকেই মিটাইতে হইবে। বাংলার কোনো নগরী ইংলণ্ডের লণ্ডনের কতটা অনুরূপ হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিয়া পুলকিত হইলে চলিবে না; ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যুগ যুগান্তের ইতিহাসের মধ্য দিয়া বাংলার পল্লীজীবন যে বিশেষত্বটুকু, বাঙ্গালীর সভ্যতার যে শ্রীটুকু বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে

বাংলার নাগরিক জীবন আরও পরিস্ফুট করিয়া, আরও সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে কি না। যদি তাহা না করে, বাংলার ধমনী যদি বাংলার পল্লীকে খাদ্য না জোগায়, তাহা হইলে সেই নাগরিক জীবনের দিকে চাহিয়া আর কাহারো যত আনন্দই হোক না, বাঙ্গালীর আনন্দ করিবার মত কিছুই থাকিবে না।

(৪)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিগত শতবর্ষের বাংলার দিকে চাহিয়া দেখিলে আমরা এই সত্যটিকে স্বীকার না করিয়াই পারি না যে, বাংলার পল্লী ও নাগরিক জীবনে একটা বিষম বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইংরাজী আমলে কি করিয়া এই বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বাংলার শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনায় বাংলার মস্তিষ্ক এবং ধমনীর মধ্য দিয়া যে অকস্মাৎ এক বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রতিক্রিয়া চলিয়াছিল, তাহা অবিদিত নাই। ইংরাজী কাব্য এবং দর্শন আমাদের নাগরিক মনকে এমন করিয়াই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, তাহাকে কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত বহুকাল লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ, বাংলার ধমনীতে জীবশরীরে বিষের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিষ বস্তুটা নিজে কিছু মন্দ নয়; যে গাছের রস মানুষে পান করিলে পাগল হয়, এমন কি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হয়, সেই রস সেই গাছের প্রাণরক্ষার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন।

যা হোক, ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার ভাবাচ্ছন্নতায় বাংলার নাগরিক আপনারও অজ্ঞাতসারে বাংলার পল্লীজীবনের ধারা হইতে বড়ই বিষমভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই জন্যই এই শতবর্ষের নাগরিক জীবন পল্লীকে তাহার প্রার্থনার বস্তু দিতে পারে নাই; তাই এই সুদীর্ঘকাল বাংলার

নাগরিক জীবনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নাগরিক এবং বৈদেশিকের নিকট যতই আনন্দের হোক, পল্লীর নিকট তাহা তেমন আনন্দ এবং শক্তি লইয়া আসিতে পারে নাই। রুশিয়ার মত দেশে তাহার বড় বড় সাহিত্যিকদের রচনা রুশিয়ার জনসাধারণের নিকট কি ভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে, তাহার কথা ক্রপ্টকিন্ যাহা বলিয়াছেন, শুনিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু বাংলার নাগরিক সাহিত্য বাংলার পল্লীকে কতটা আনন্দ দিতে পারিয়াছে? বাংলার নাগরিক সাহিত্য কি আজও জনসাধারণের নিকট একটা অপরিচিত বস্তুর মতই রহিয়া যায় নাই? প্রচারের অভাবে যে এমনটি হইয়াছে তাহা ত মনে হয় না; মনে হয় এই যে, নাগরিক সাহিত্যের ভাব ও ভঙ্গী বাংলার মর্ম্মজীবনের নিকট পরিচিত নহে, তাই এই সাহিত্যের রস পল্লীপ্রাণকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিতে পারে নাই।

(৫)

তবে কি নাগরিক সাহিত্য আপনাকে সাহিত্য বলিবার দাবী করিতে পারে না! ইহাই বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদের একটি কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। মন বস্তুটার ধর্ম্ম সর্ব্ব মানবেরই মধ্যে এক, যদিও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতায় সেই মনের সংস্কারগুলি বিভিন্ন এবং বিচিত্র হইতে বাধ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের শিক্ষাদীক্ষায় পরিপুষ্ট নাগরিকের মনে যদিও বাংলার নিজস্ব জাতীয় সংস্কার সহজ ও স্বাধীনভাবে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই, তবু পাশ্চাত্য জীবন-মনের প্রভাবে বাংলার নাগরিক মন যে একটা না একটা গঠন পাইয়া আসিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

এই নাগরিক বাংলা তাই যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সহিত

বাংলার নিজস্ব মর্ম্মগত বৈশিষ্ট্যের যোগ না থাকিলেও তাহা একেবারেই কিছু হয় নাই,—একথা বলা চলে না। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহার মধ্য দিয়াও প্রাণের একটি প্রকাশ ঘটিয়াছে, এবং সেই জন্য নাগরিকের নিকট এই সাহিত্য বিশেষ সমাদর পাইয়াও আসিয়াছে। এমন কি এই সাহিত্য যে-পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অনুপ্রেরণা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, সেই পাশ্চাত্যের নিকটও এই সাহিত্যের যথেষ্ট সমাদর হইতে পারে। কিন্তু তবু এই সাহিত্যকে কিছুতেই বাংলার খাঁটি সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই শতবর্ষের বাংলাসাহিত্য জাগরণ-যুগের সাহিত্য বলিয়া চিরকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় স্থান লাভ করিলেও, আর শত বর্ষ পরে এই সাহিত্যের কতখানি তখনকার বাংলাকে অনুপ্রাণিত করিবে, তাহা আজ বলিবার উপায় নাই। বাংলা তাহার প্রাচীন সাহিত্যকে আজও তাহার জীবনে যতখানি মিলাইয়া রাখিয়াছে, বর্ত্তমান সাহিত্যের ততখানি বাংলাব জীবনের সহিত, তাহার মর্ম্মের সহিত মিশাইয়া থাকিবে বলিয়া ভরসা হয় না। ফল কথা, যতদিন আমাদের নাগরিক জীবন—আমাদের নাগরিক সমাজের শিক্ষাদীক্ষা—পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহকে কাটাইয়া উঠিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জাতীয় সাহিত্যের সত্যস্বরূপ দেখা অসম্ভব হইয়াই থাকিবে।

(৬)

যদিও' সাহিত্যের যাহা চিরন্তন রসবস্তু, তাহা সর্ব্বমানবেরই চিত্তের সম্পদ্, যদিও সাহিত্য সত্য হইলেই তাহা চিরকালই বিশ্বজনীনতার দাবী করিতে পারে স্বীকার করি, তবু তাহা কখনও বিশিষ্ট আধার ভিন্ন আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে না। জীবনবস্তুটি বিশ্বজনীন বস্তু; কিন্তু তাহার যেখানে প্রকাশ, সেখানেই সে বিশিষ্টরূপের, বিশিষ্ট আধারের

কতকগুলি সীমাকে স্বীকার করিয়াই এবং তাহাদের সহিত আপনাকে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। তেমনি সাহিত্যকেও প্রকাশ পাইতে হইলেই তাহাকে কোনো একটি বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে বিকশিত হইতে হইবে; সেই জন্যই তাহার ব্যক্তিত্বের—সুতরাং জাতীয়তার—ছাপ গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। শরৎ-সাহিত্যের রসবস্তু বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু শরৎসাহিত্যের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মর্ম্মগত ব্যক্তিত্বের যে একটা ছাপ পড়িয়াছে, তাহা একান্ত-ভাবে শরৎচন্দ্রেরই, তাহাকে কখনও অন্যের বলিবার উপায় নাই।

এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটা একটা হাওয়াও নহে, মায়াও নহে, ইহা নিতান্তই মাটির রসে পরিপুষ্ট। যে-বাঙ্গালীর মধ্যে বাংলার সমাজ-সভ্যতার বিশিষ্ট সংস্কারটি প্রকাশ পায় নাই, তাঁহাকে আর যাহাই বলি না কেন, খাঁটী বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। আমাদের নাগরিক জীবন আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে আমরা যেমন এ দেশী বলিতে পারি না, তেমনি তাহাকে আবার একেবারে বিলাতী বলিতেও পারি না। এই নাগরিক জীবনটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ—দেশী মনের উপর বিদেশী শিক্ষার চাষ হইলে যাহা হয় তাই। ইহার ফলে দেশী মন যেমন বিকশিত হইয়া তাহার সহজ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে পারিল না, তেমনি বিদেশী ভাবটিও তাহার প্রকাশোপযোগী রূপটিকে পাইতে পারিল না। এই সাহিত্যকে তাই না-মাটির, না-আকাশের হইয়া থাকিতে হইয়াছে—অন্ততঃপক্ষে বাংলার পল্লীদেবতার দৃষ্টিতে।

(৭)

সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার লীলা অপরিসীম, একথা স্বীকার করিতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটিও স্মরণীয়

যে, যেখানে আমাদের এই কল্পনার কারখানা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে—মনের সেই গোপন লোকে—কাল্পনিক বলিয়া কিছু নাই, সেখানে আমাদের মন সংস্কারমূলক অভিজ্ঞতার মাল মস্‌লা লইয়া সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। নাগরিক মন যে বৈদেশিক সংস্কারকে লইয়া সৃষ্টিকার্য্যে বসিয়াছে, মুস্কিল এই যে, সেই সংস্কারকে সে একেবারে জীবন্ত করিয়া পায় নাই। আমাদের নাগরিক জীবন একদিকে যেমন বাংলার পল্লীজীবনের, বাংলার জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সংস্কারের বাস্তব এবং জীবন্ত স্পর্শটিকে বর্জ্জন করিয়াছে, অপরদিক দিয়া তেমনই বৈদেশিক ভাবের বাস্তব সংস্পর্শ লাভের দুরাশায় কেবলই বৈদেশিক সাহিত্যের কল্পমন্দিরে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে।

ফলে, নাগরিক সাহিত্যের কল্পনা যেমন দেশের বাস্তব সমাজের ক্ষেত্র হইতে রস সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তেমনি বৈদেশিক ভাব যেখানে একান্ত সহজে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, সেই বৈদেশিক সমাজের সত্য সংস্পর্শকেও সে পাইতে পারে নাই। সুতরাং কল্পনা বিকৃত হইয়া এমন একটা জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাকে না পাই বৈদেশিক সমাজে, না পাই স্বদেশী সমাজে, পল্লীর জীবনে। এই কারণেই এই শতবর্ষের সাহিত্য অনেকটা অসত্য হইয়াছে ; উহার মাঝে অনেক খাদ মিশান রহিয়াছে।

(৮)

কিন্তু যদি দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা সমাজের কোন একটা অংশে চলিতে থাকে, তাহা হইলে যে অন্ততঃ সেই অংশে একটা অভিনব অথচ সত্য জীবন গড়িয়া উঠিবে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সংস্কার বস্তুটা ত আর শাশ্বত কালের নহে। উহার মধ্যে পরিবর্ত্তন খুবই সম্ভব। এই জন্য একটা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব নাও হইতে পারে। যদি কোথাও এই সমাজ গঠিত হইয়া থাকে এবং যদি

সমাজের সেইখানে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও সাহিত্য নামের যোগ্য হইবেই, তাহাকে না-মাটির, না-আকাশের বলা যাইবে না। কিন্তু সত্যকার সাহিত্য হইলেও তাহাকে বাংলার নিজস্ব জাতীয় সাহিত্য যে বলিতে পারা যাইবে না, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না। অবশ্য যদি উক্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজই সমগ্র বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্যকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া তোলে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

সে যাহোক্, মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে গত শত বর্ষের বাংলা সাহিত্যে যে বৈদেশিক ভাবের ছাপ পড়িয়াছে, তাহা কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনের সহজ সংস্কার হইতে নহে; তাহার উদ্ভব আমাদের ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার অস্থায়ী কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কার হইতে। কিন্তু এইভাবে উদ্ভূত অসত্য এবং সাময়িক সাহিত্য যে আবার জীবনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে আমাদের জীবনে একটা স্থায়ী বিকার আনিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এইখানেই সত্যকার পাশ্চাত্য বিজয় আরম্ভ হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সত্য সার্থকতা এইখানে—জাতীয় অধোগতির একমাত্র ভয় এইখানে।

(৯)

যে জীবদেহে জীবনীশক্তি বেশ প্রবল এবং জাগ্রত, তাহার মধ্যে যদি তাহার স্বভাবের প্রতিকূল কোনও বস্তু প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে সেই বস্তু কখনও সেই জীবদেহে বেশীক্ষণ নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারে না; সমগ্র দেহ তাহার বিরুদ্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়া, আত্মরক্ষার প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া, সেই বস্তুকে বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু যাহার মধ্যে জীবনীশক্তি অতি অল্প, তাহার মধ্যে যদি কোন বিষম বস্তু আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া যে বিষের মতই ভয়াবহ এবং প্রাণঘাতক হয়, তাহা কাহারো অজ্ঞাত নাই।

বাংলার নাগরিক জীবনের মধ্যে—এবং কাজে কাজেই 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্যে—যে বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ফল যে খুব শুভ হইয়াছে, একথা খুব জোর করিয়া বলা চলে না। কিছুকাল পূর্ব্বে যদিও এ বিষয়ে আমাদের কোন মতদ্বৈধ ছিল না যে, শিক্ষা বস্তুটা সমুদ্র পার হইতে প্রভুরা আনিয়া আমাদিগকে এবং আমাদের অধস্তন কয়েক পুরুষকে একেবারে মহামুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, তবু আজ এ বিষয়ে একটা প্রবল দ্বিধা আসিয়াছে যে, এই মহামুক্তিটা আমাদের পক্ষে তেমন কামনার যোগ্য কিনা! আজ তাই এই কথাই শোনা যাইতেছে যে, বাংলার পল্লী-জীবন এই নাগরিক শিক্ষা দীক্ষা হইতে কোন উন্নতিকেই প্রাপ্ত হয় নাই, উহা বাংলার পল্লীকে কোনো শক্তিরই সন্ধান দিতে পারে নাই। ফলতঃ, এই বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষা ও ভাব, নগরে ও পল্লীতে বিচ্ছেদ আনিয়া, বাংলার জীবনকে দিন দিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছিল। একটা মস্ত অদৃশ্য বাদুড় বুঝিবা বাংলার প্রাণ শোষণ করিয়া পুষ্ট হইতেছিল, কিন্তু সেই প্রাণশক্তি যে বাংলার সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হয় নাই, তাহার প্রমাণের বোধ করি অভাব নাই। তাই বলিতে হয় যে, এই নাগরিক সভ্যতা ও সাহিত্য দেশের পল্লীপ্রাণকে সরস ও সঞ্জীবিত করিতে না পারিয়া ব্যর্থ হইয়াছে।

(১০)

বাংলার প্রাণশক্তি তাহার মোহাচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই বাংলার সাহিত্যে আবার তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে যে-জীবন শতাব্দীর পর শতাব্দী আপনার ভাবগত বৈশিষ্ট্যকে অজস্র বিকৃতি সত্ত্বেও নষ্ট হইতে দেয় নাই, নাগরিক সাহিত্য সেই পল্লীজীবনের দিকে মমতাপূর্ণ নেত্রপাত

করিয়াছে। গানে তাহার পল্লীর সুর, গল্পে তাহার পল্লীচিত্র, কাব্যে তাহার পল্লীর আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখ, এবং চিন্তায় তাহার পল্লীরই অভাব অভিযোগের কথা যে অল্পে অল্পে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, নাগরিক সাহিত্যের আত্মস্থ হইবার ইহাই পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হয়।

যদি বাংলার নাগরিক জীবন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে পারে, যদি সে আপনার জাতীয় শক্তিসাধনার উৎসটিকে বিদেশী ভাব-সংমিশ্রণ হইতে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলা দেশে তাহার সত্যকার সাহিত্য পরিপূর্ণ শান্তশ্রী লইয়া বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

অবরুদ্ধ সাহিত্য

(১)

জীবনে অনুভূতির আবেগ জাগিলেই তাহা যেমন করিয়া হোক আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইবেই। সহজ জীবনের মাঝে অনুভূতি স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইবে; কিন্তু মানুষের জীবনটা প্রায়ই সহজ বাধাহীন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। যদিও প্রকাশ বলিতেই কোনো না কোনো ভাবের বাধাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াই বোঝায়, তবু সময় সময় বাধার বিপুলতা প্রকাশের গলা টিপিয়া ধরে, তখন 'শাসন-সংযত-কণ্ঠে' গান ফুটিতে চাহিলেও পারে না।

ভয় যখন মানুষকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন সে জানিতেই পারে না যে সে ভয়গ্রস্ত হইয়া আছে; ভূতে পাইলে যেমন ভূতগ্রস্তের সে বিষয়ে জ্ঞানই থাকেনা, তেমনি। মানুষ যে ভয় পাইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে ঠিক তখনই, যখন তাহার প্রাণপুরুষ ভয়ের মোহকে কাটাইয়া উঠিবার সংগ্রাম আরম্ভ করে। জাতিসম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(২)

বাঙ্গালী পরাধীনতাগ্রস্ত হইয়াছিল। পরের ভাবের আচ্ছন্নতায় সে আপনার অস্তিত্বকেই একরকম হারাইয়া ফেলিয়াছিল; সে একরকম বালাই মিটিয়াছিল। কিন্তু একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল সেই দিন, যে দিন তাহার প্রাণপুরুষ হঠাৎ কোন্ সোণার আলোকের উজ্জ্বল স্পর্শে জাগিয়া উঠিল, আর জাগিয়া উঠিয়াই চারিদিকে অন্ধকারার কঠিন স্পর্শ অনুভব করিল।

সেই দিন ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন সে এমন করিয়া আপনাকে—আপনার মাথাটাকে অন্ততঃ—স্বকীয় বলিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিল। নির্ঝরের যাত্রা সেদিনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু নিদ্রা তাহার ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিলেই যে শক্তি আসিবে, এমন কোন কথা নাই। ঘুমাইবার অপরিসীম ক্ষমতা যাহার, তাহার যে চলিবার শক্তিও তেমনি অপরিমেয় হইবে, ইহার বিপরীত প্রমাণই প্রচুর রহিয়াছে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রাণের গাঁঠে গাঁঠে খিল ধরিয়া গেলে, জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অশক্তির বোধটিই তাই সাধারণতঃ একটু অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তাই কি শক্তিশালী সাহিত্যিকদের প্রবল জীবনের প্রথম জাগরণ নিরাশার সঙ্গীতময়? তাই কি 'প্রভাত-সঙ্গীতের' পূর্ব্বে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতের' করুণ সুর আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে?

(৩)

জীবন একবার যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সে সহজে আবার ঘুমায় না, ঘুমাইতে পারে না। কারণ, জাগরণ চিরকালই ক্লান্তির অন্ততঃ আংশিক অবসান না হইলে ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ, একটা জাতিকে জাতি যখন জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার পশ্চাতে একটি নবীন শক্তির প্রেরণা নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

বাংলা জাগিয়া উঠিয়া ঘুমাইতে পারে নাই; কিন্তু তা বলিয়া সে আপনার শক্তিকেও পরিপূর্ণ করিয়া পায় নাই। তাহার জীবনের সহস্র জড়তা ও অশক্তি তাহাকে অতীতের হীনতার মধ্যেই বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। নানাভাবে তাই সে তাহার দুরবস্থাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বে স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, মানুষের কামনার প্রকাশ যেমন তাহার কর্ম্মে, তেমনি তাহার স্বপ্নে এবং সাহিত্যেও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, বাস্তবক্ষেত্রে মানুষ যাহাকে সত্য করিয়া, মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে না, তাহার প্রকাশ তাহার সাহিত্যে, স্বপ্নে, কল্পনায় খুবই বেশী হইয়া থাকে। এই জন্যই বাংলার নব জাগরণের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তাহার জীবনের দুরবস্থাকে নানাভাবে অস্বীকার করিবার চেষ্টা স্পষ্টই দেখিতে পাই।

(৪)

বাস্তবজীবনে আমরা আমাদের অবাঞ্ছিত দুরবস্থাকে কি ভাবে অস্বীকার করিয়া থাকি, তাহার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, বাংলার উক্ত সাহিত্যের একটা দিক্ দেখিবার চেষ্টা করিব। যে নিজের হীনতা কিছুতেই ঢাকিতে বা দূর করিতে পারে না, তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টাই দেখিবার বিষয়। যার নিজের কোনই মূল্য নাই, সে নানা রকমের নজীর দিয়া এই কথাটিই প্রমাণ করিতে চায় যে, তাহার ধমনীর মধ্যে যাঁহাদের উষ্ণ রক্ত রহিয়াছে তাঁহারা ছিলেন ঋষি, কিংবা রাজচক্রবর্ত্তী, কিংবা এই রকমের একটা বিরাট কিছু, এবং অতীতের মহান্ গৌরবময় ইতিহাসের দিকে লোকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়া সে নিজের দৈন্যকে অন্তরালে রাখিবার আশা করিয়া থাকে।

আর একটি উপায় হইতেছে নিজের পরিচয়টাকে গোপন করিয়া, মহত্তর পরিচয়ের মধ্যে আপনাকে কোনো রকমে মিশাইয়া দেওয়া। এই জাতীয় চেষ্টা যে হীনতাকে জয় করিবার স্বাভাবিক এবং সঙ্গত উপায় নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু জীবনের দায় স্বাভাবিকতা এবং ঔচিত্যকেও খর্ব্ব করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বাভাবিক উপায়ে আপনার শক্তির দ্বারা মহত্বের সিংহাসন অধিকার করিবার সাহস না থাকিলে, তখন বাধ্য হইয়া অনুচিত পন্থার আবিষ্কার জরুরী হইয়া পড়ে।

(৫)

বাংলার নব জাগরণ নানাদিক দিয়াই বাধাকে অনুভব করিয়াছিল। এখানে শুধু একটি দিকের কথাই বলিবার চেষ্টা করিব। সেটি হইতেছে বাংলার স্বাধীনতার কামনা; এই কামনার পথে নিষেধের বাধা এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, একদিন এই কামনার কথা ঘুমের ঘোরেও যদি কেহ উচ্চারণ করিত, তাহা হইলেও বোধ করি তাহাকে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতে। বাস্তবক্ষেত্রে এই কামনা যে কতখানি অসম্ভব ঠেকিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যাক।

কিন্তু বাধা যত বৃহৎই হোক না, কামনাও ছিল তেমনি সত্য। তাই বাংলার অন্তরের কামনা প্রথম প্রকাশ পাইল অতীত গৌরব-কীর্ত্তনে। ফলে, বাংলার ইতিহাস রচিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রত্নতাত্ত্বিক বাংলার মাটি খুঁড়িয়া তাহার অতীত গৌরবকে তুলিয়া ধরিয়া বর্ত্তমান হীনতার লজ্জা হইতে কতকটা পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর, যেমন করিয়া হোক, বাঙ্গালী যে বড়র বংশেই জন্মিয়াছে,—এ কথাটাও প্রমাণ করিবার প্রবল প্রয়াস আরম্ভ হইয়া গেল। বাংলার সেই নব জাগরণের দিন, সভায়-সমিতিতে, কাগজ-পত্রে কেবলই বাঙ্গালী যে 'সেই আর্য্যকুল-প্রদীপ', এ কথাটা লইয়া ফুটবল রঙ্গ-ক্ষেত্রে ফুটবলের মতই লোফালুফি চলিতে লাগিল। কেবলই 'আমরা এই ছিলাম', 'আমরা সেই ছিলাম', এই আস্ফালনে আর অন্য কিছু ভাবিবার বা করিবার অবসরটুকুও সে দিন যেন হারাইতে বসিয়াছিল।

(৬)

তারপর বাঙ্গালী দেখিল যে প্রাণ ইহাতে ভরে না। দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইবার দুরাশা তাহার মন হইতে ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল।

তখন হইতে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের আবির্ভাব। যথেষ্ট বিঘ্ন অপমান মাথায় লইয়া সে বাস্তবের পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছিল—সে দিন। আর স্বপ্ন ও সঙ্গীতের মাঝ দিয়া আপনার নিগূঢ় কামনাকে মূর্ত্তিমতী করিবার সাহসও সে পাইয়াছিল সেই দিন। হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, নবীন, বাংলার জীবনের সেই দিবারম্ভের প্রথম বৈতালিক। 'বৃত্রসংহারে', 'পলাশীর যুদ্ধে', 'আনন্দমঠে' বাঙ্গালী সেদিন কি দেখিয়াছিল, এখানে সে কথা আর বিশদ করিয়া বলিতে হইবে কি?

কামনার বিপুলতাই কিন্তু বাংলার পথখানিকে প্রচণ্ড বাধায় ভরিয়া দিল। সেই বাধায় বাঙ্গলার প্রাণের গতি বিপর্য্যস্ত হইল, সাহিত্যে পর্য্যন্ত তাহার কামনার অবারিত প্রকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। কামনা যখন বাহিরের দিক দিয়া বাধা প্রাপ্ত হয় তখন সে যে নষ্ট হইয়া যায় না, একথাটা মনস্তত্ত্বের মামুলি কথা হইলেও শাসনশাস্ত্র তাহা মানিতে চাহে না। কামনাকে আংশিক পরিতৃপ্তি দিলেও তাহা অনেক সময় প্রশমিত হইয়া যায়, এ কথাটা যদি শাসনশাস্ত্র স্বীকার করিত, তাহা হইলে সে যে বাংলার লেখনী এবং রসনাকে নিরস্ত করিবার কঠোর চেষ্টা করিত না, তাহা নিশ্চয়। সে যা হোক, তাহা হয় নাই ; ফলে অবরুদ্ধ কামনা জীবনে এবং সাহিত্যে সংগোপনে আত্মপ্রকাশ করিবার যে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

(৭)

জীবনে কি ভাবে বাংলার রুদ্ধ স্বাধীনতার একান্ত কামনা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস সবে মাত্র লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গোপন পথে বাংলার সেই ভীষণ-মধুর অভিসার হইয়াছিল, বাংলার তরুণ বুকের রক্তপিচ্ছিল পথে। সে কথা এখানে থাকুক—

সাহিত্যে কেমন করিয়া বাংলা তাহার এই কামনাকে চরিতার্থ করিতেছিল, তাহার কথাই এখানে বলিব।

বাঙ্গালী যখন তাহার অতীত জীবনে পৌরুষ এবং বীর্য্যের, অসাধারণ সাহস এবং ধৈর্য্যের কোন উপকরণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখন সে আপনাকে সাহিত্যের কল্প-জগতে রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়া তুলিল। তাই বাঙ্গালী সেদিন এত বেশী রাজস্থানের বীর-চরিত্রকে আপনার সাহিত্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল। রাজপুত ইতিহাসের আলোচনা করিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না, নাট্য-জগতে রাজপুত বীর জীবন্ত হইয়া দেখা দিল। রাজপুত বীরের মুখ দিয়া সেদিন বাংলা যে সব কথা বলিল, সে সব অতীত কাহিনী নয়, বাংলারই মর্শ্মের মধ্যে যে সব কথা টগ্‌বগ্‌ করিতেছিল, তাহাই রাজপুতের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে নাই কি ?

(৮)

হেম, নবীন, বঙ্কিমের কথা বলিয়াছি। আর একজনের কথা বলিব। তিনি দেশাত্মবোধের আগ্নেয়গিরি, পৌরুষের ও আত্মাভিমানের মূর্ত্ত আদর্শ, পুরুষসিংহ দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁহার রচনার মধ্যে যে মহান্‌ আদর্শ গৌরবে ও মহিমায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, দেশ-প্রেমিকের যে কান্না হা-হা করিয়া উঠিয়াছে, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত জীবনেরই প্রকাশ স্বীকার করিলেও, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, তাহার মধ্যে বাংলার প্রাণপুরুষেরই অন্তরতম কামনাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি যে বাংলার একজন যুগ-প্রবর্ত্তক, জাতীয় জীবনের তেজোদ্দীপ্ত পুরোহিত ছিলেন, তাহা বাংলার অন্তরাত্মা স্বীকার না করিয়াই পারে না।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের এই দুইচারিজন মহাপুরুষের কথা বাদ দিলে কি

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা বাংলার বর্ত্তমান জীবনের সত্য পরিচয় পাইয়া থাকি ? বাংলা আজ বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী জাগ্রত, তাহার অন্তরের মুক্তিকামনা ঢের বেশী স্পষ্ট। কিন্তু সেই দিনের তুলনায় বর্ত্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে—কল্প-সৃষ্টিতে এবং আলোচনায়—তাহার বর্ত্তমান জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার তেমন কোন ছাপ পড়িয়াছে কি ?

(৯)

যে জাতির কামনা তাহার সাহিত্যের মধ্যেও আপনাকে ছদ্মবেশে প্রকাশ করিতে বাধ্য, সেই জাতির প্রাণের পথে যে কত বড় বাধা রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—সে ত আজিকার কথা নহে ; আর মুক্তিকামনা তাহার অন্তরের যে কত বড় সত্য কথা, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। অথচ এত বড় কামনার প্রকাশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরই জীবন-চিত্রের মধ্য দিয়া আজও তেমন করিয়া প্রকাশ পাইল না। বাংলার উপন্যাসের নায়ক আজও নায়িকার সহিত বিরহ-মিলনের অভিনয় লইয়াই মাতিয়া আছেন, দেখিতে পাই। ইহা যে বাংলার তরুণ যুবক-প্রাণের সত্যকার চিত্র নহে, সে যে আজ একটি বৃহৎ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অন্তঃ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে তরুণী-বিরহের দীর্ঘশ্বাসই বিক্ষোভ তুলিতেছে না, এ কথা কি আজ অস্বীকার করা চলে ? সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যে বাংলার বর্ত্তমান জীবনের অপ্রকাশ, ইহার মূলে রহিয়াছে প্রচণ্ড বাধার সহিত সংঘর্ষ।

এই বাধা আজও বড় হইয়া আছে বলিয়াই বাঙ্গালীর বীর্য্যের সন্ধান করিতে গিয়া বাঙ্গালী সাহিত্য-শিল্পীকে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের বিস্মৃত কাহিনীর সন্ধানে ব্যস্ত হইতে হইতেছে। অন্ততঃপক্ষে ঐতিহাসিকতার

আড়াল সৃষ্টি না করিয়া বাংলার প্রাণ আজও কথা বলিতে পারিতেছে না। না পারিবারই কথা; যে দেশে কোন পুস্তকের নামকরণ করাই একটা বিপদ, সে দেশে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিবার সাহস একটা দুঃসাহস,—তাহাতে সন্দেহই নাই।

(১০)

কিন্তু বাংলার প্রাণ জাগিয়াছে। ভাবের পাগল বাঙ্গালী কখনও বাধাকে স্বীকার করিয়া আর বসিয়া থাকিবে না। বাস্তব জীবনক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রাণের দরদেই প্রাণের মায়াকে কাটাইয়া নামিয়া পড়িয়াছে। তাই আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার নির্ভীক শিল্পীর তুলিকায় বাঙ্গালীর এই নব-জাগ্রত প্রাণটি সহজ হইয়া প্রকাশ পাইবে। তখন বাংলার শিল্পীকে প্রাণের মসলা সংগ্রহ করিবার জন্য রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ঘাঁটিতে হইবে না; বাংলা দেশের প্রাচীন রাজবংশের কাহিনীকেও কল্পনার রঙে রাঙাইয়া তুলিতে হইবে না।

বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের বাংলার জীবনের দিকে যখন বাংলার ভীতিমুক্ত শিল্পী চোখ মেলিয়া চাহিবেন, তখন যে তিনি তাহার মধ্যে বিশ্ববাসীর সম্মুখে গর্ব্বে ও গৌরবে বুক ফুলাইয়া বলিবার মত অনেক কথা, দেখাইবার মত অনেক ছবি পাইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা আজ প্রতীক্ষা-ব্যগ্র নেত্রে সেই প্রাণশিল্পীর পথ চাহিতেছে, যাঁহার চিত্রে ও গানে, কথা ও কাহিনীতে তরুণ বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনখানি সহজ ও দ্বিধাহীন রূপ লইয়া বিশ্ব-সভার সম্মুখে দাঁড়াইবে, যাঁহার কল্পসৃষ্টির মধ্যে তরুণ বাংলা আপনাকে দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকে শিহরিয়া উঠিবে। ছদ্মবেশের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইয়া বাংলার বাস্তব সাহিত্য সেদিন স্বাস্থ্যে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

সাহিত্যে পতিতা

সমাজের এবং নীতির বিচারে যাহারা পতিতা, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকেরা সেই সব নারীচরিত্র লইয়া বিশেষভাবে শিল্পসৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা লইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যাহা প্রচলিত, যাহা প্রথাগত, তাহাকে ডিঙ্গাইয়া কোন কিছু করিতে গেলেই তাহা বিরুদ্ধ আলোচনার উদ্রেক করে, প্রাচীন চিরকালই নবীনকে সন্দেহের ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিকূল আলোচনা হইতেই কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যায় না যে, কল্পসাহিত্যে এই যে পতিতা চরিত্রের আলোচনা—ইহা দূষণীয় কিনা।

সর্ব্বপ্রথম দেখা যাক যে, আপত্তি কি লইয়া। কেহ বলিতেছেন, পতিতা যে, তাহাকে আঁকিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাকে ঘৃণিত করিয়া আঁক। যদি তাহা না কর, তবে ও সৃষ্টি অসত্য হইবে, অস্বাভাবিক হইবে; কারণ, পাপীকে দেখিয়া ঘৃণা, পাপীর দণ্ড ও বিষময় পরিণাম—ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কেহ বলিতেছেন, পতিতাকে মনোরম করিয়া আঁকা হইতেছে, পাপ লোভনীয় হইতেছে, ইহাতে পাঠকের রুচিবিকার জন্মিতেছে। ইহাতে মানুষকে পাপের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আবার অনেকে বলিতেছেন, পতিতা-সমস্যাটা একটা মিথ্যা সমস্যা; উহা কোথাও নাই। জগতে চিরকালই পতিতা হইয়াছে ও থাকিবে; তাহাদের জন্য এই যে বেদনা ও সহানুভূতি, ইহা উচ্ছ্বাসমাত্র, ইহার ফল আরো পতন মাত্র। যাহাদের জন্য এই ব্যথা, তাহাদের উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই; বরং ব্যথা দেখাইতে গিয়া যুবকদের লোভে পড়িয়া পতন অনিবার্য্য। সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে, সুতরাং পতিতার প্রতি ঘৃণাকে প্রবল করিয়া তোলাই সমাজ-রক্ষার উপায়।

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে এই কয়টি বড় বড় আপত্তিই সমাজে স্বাস্থ্যরক্ষার নামে হইতেছে।

* * * *

প্রথম কথা, পতিতা-চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া। পতিতা পাপী, চোরও পাপী, যে দরিদ্রকে বেশী সুদে টাকা ধার দিয়া তাহার ঘরবাড়ী নীলাম করিয়া লয় সেও পাপী, যে ডাক্তার বেশী ভিজিট লইয়া গরীবের সর্ব্বনাশ করে সেও পাপী, যে উকীল মক্কেলকে ক্ষেপাইয়া বিদ্বেষ-বহ্নিকে আরো বাড়াইয়া তোলে সেও পাপী, যে বণিক্ বিদেশী পণ্যে দেশ ভরে সেও অনেকের বিচারে পাপী, যে ধনী শ্রমিক-সম্প্রদায়ের আলো-হাওয়া চুরি করিতেছে সেও পাপী, যে গুরু ধর্ম্মের নামে শিষ্যের বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত হরণ করে সেও পাপী, এই সমস্ত পাপীর মধ্যে সেই নারী যে আপনার কাম-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়াছে এবং হয়ত ফিরিবার এতটুকুও পথ না পাইয়া প্রবল পুরুষেরই ভোগের দাবী মিটাইবার জন্য পতিতা হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে, সেও পাপী।

কিন্তু সব চেয়ে বড় পাপী ওই পতিতা, নির্ব্বোধ নারী! সমাজ আর কাহাকেও ঘৃণা করিবার তীব্র আদেশ প্রচার করে নাই, কিন্তু কঠোরকণ্ঠে বলিয়াছে ওই পতিতার শাস্তি চাই, তাহাকে নিদারুণভাবে ঘৃণা করা চাই-ই চাই! বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্দেশের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ, তাহাতে আজও অনেকেরই কোনো সন্দেহ নাই।

তবু কারও কারও মনে ইহা লইয়া সংশয় জাগিয়াছে, ইহাও সত্য কথা। তাঁহারা পতিতার ভুল-ত্রুটি-স্খলনকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু পাপের ওজন বাস্তবিকই প্রাচীন সামাজিক মানদণ্ডে যতটা হইয়াছিল ততটা কিনা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক সময়ে চুরি করিলে হাত কাটিয়া দেওয়া হইত, তাহাতে চুরি খুব কম হইত শোনা যায়। এখন চোরের শাস্তি কম,

তাই চুরি বেশী হয়। তবু বোধ করি কেহই প্রাচীন দণ্ডনীতির পুনঃ প্রবর্ত্তন কামনা করেন না। তেমনি এক সময়ে পতিতার পতনকে সমাজ খুব গুরুতর করিয়া দেখিয়াছিল, তাহাতে হয়ত সমাজ-ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। আজ অনেকেই উহাকে অন্যায় মনে করিলেও একেবারে "অতি ভীষণ" ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের কমিয়া গিয়াছে। জুজুর ভয়ে শিশু বেশ শিষ্ট হয়, কিন্তু মানুষ হয় না। তেমনি সামাজিক জুজু-ভীতিটাও কম হইয়া আসিলে হয়ত শিশুটি দুরন্ত হইবে, কিন্তু নিৰ্জ্জীব হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। এই সব কারণে পতিতাকে একটা অতি জঘন্য কিছু মনে না করিবার দিকেই বর্ত্তমান যুগের ঝোঁক। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দিবার নিদারুণ আগ্রহও আজ কম। ইহাকে কেহ বলিতেছেন ঘোরতর অবনতি এবং সর্ব্বনাশের সূচনা, আর কেহ বলিতেছেন মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের ফল।

আরো কথা আছে। অনেকে পতিতার পাপকে বাস্তবিকই অতি ভয়ানক বিবেচনা করেন। তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রবচন ছাড়া যুক্তি বিশেষ কিছু নাই। আবার অনেকে বলেন, পাপ ভয়ানক না হইলেও অন্যে যাহাতে ইহাতে প্রবৃত্ত না হয় সেই জন্য পাপের শাস্তি বেশী হওয়া উচিত। রামকে লাঠিপেটা করিয়া (সামান্য কারণে) যেদো-মেধোকে সৎপথে আট্‌কাইয়া রাখিবার চেষ্টা শুভ, কিন্তু অন্যায় করিয়া ন্যায়কে রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তও মন্দ নহে!

আর, এই যে দৃষ্টান্তস্বরূপ পতিতাকে হেয় করিয়া অতি দুঃখময় করিয়া দেখাইবার প্রয়াস, ইহার অর্থ কি? অন্য শতসহস্র রকমের পাপী তো রাজাবাহাদুর খেতাব পাইয়া, দশ জনের মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া বেশ চলিয়া যায়, শুধু ওই নিঃসহায়া পতিতাই যদি ঘটনাচক্রে একটু সুস্থ শরীরে মারা যায়, তাহা হইলেই কি জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়!

তারপর ঘৃণাটাই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, বা সব চেয়ে বড় কথা? যে পতিতার দিকে কেবলই ঘৃণা-কুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি, সে কি আমার ঘৃণার যোগ্য? যে সমাজ তাহার ত্রাণের এতটুকু পথ করিতে পারে নাই, সেই সমাজের আমি কি তাহার ঘৃণার যোগ্য নই? সে তো পরের কথা, ঘৃণা কি একটা আদর্শ? না, করুণা এবং ভালবাসা? পাপকে, পতনকে পতন বলিয়াই মানিলাম, তবু যে পতিতা তাহার জন্য কি করুণা অসম্ভব?

* * * *

'পতিতা' কথাটা ত তোমার গড়া কথা। তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যে পতিত হইল সে কি তৎক্ষণাৎ অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া গেল? তাহার একটা সামান্য অপরাধ তোমার দৃষ্টির সম্মুখে একটি ঘৃণার যবনিকা টানিয়া দিল, কিন্তু তাহার ভালমন্দ-মেশানো কল্যাণ-অকল্যাণের লাল-নীলের জীবনখানি বোনা ত বন্ধ হইয়া গেল না! তুমি তাহার ওই একফোঁটা কালির দিকে দৃষ্টিকে একাগ্র করিয়া কালো ছাড়া আর কিছুই না দেখিলেও তাহার জীবনে নীলের খেলাও চলিতেছে—তাহারও জীবনে কোথাও শুচিতা আছে, শক্তি আছে, দীপ্তি আছে, পুণ্য আছে। তুমি আপনার কামকে সমাজের কায়দায় বেশ রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে অন্য নাম দিয়া বেশ গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছ, পতিতা পারে নাই বলিয়াই কি সে নরকে পড়িয়া গেল? এই মিথ্যাকথা কতকাল বলিবে? পতিতার মনুষ্যত্ব নাই, এ কথা না বলিলে কি ঘুম হইবে না?

না, 'পতিতা' তোমার আমার দশজনের চেয়ে বেশী পতিত মন লইয়া বাস করে না। তারও দয়া মায়া হয়, তারও ভগবানের কথা মনে পড়ে, তারও মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তারও ভালবাসা আছে, আত্মনিবেদন আছে, উৎসর্গ আছে—আত্মার সংগ্রাম আছে, পতন নাই। পতিতাও অবস্থা বিশেষে

শ্রদ্ধা পাইতে পারে, পূজা পাইতে পারে; সুতরাং পতিতা নারী আমার আদর্শ না হইলেও, আমার ঘৃণার পাত্রীও নহে। ঘৃণা বস্তুটা আমার সত্যকে দেখাইতে পারে না।

জীবনকে সত্য করিয়া দেখিতে হইলে তাই পতিতাকেও ভালমন্দের মিশ্রণ করিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ জীবনকে দরদের সঙ্গে দেখিতে হইবে। ঘৃণার বাণে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য যাহার, সে জীবনকে সত্য করিয়া দেখিবার শক্তি রাখে না। বাণের ইঙ্গিত পাইলে হরিণ যে দাঁড়াইয়া দ্রষ্টার সম্মুখে খেলা করে না, ইহা সকলেই জানে।

* * * * *

এখানে আবার অনেকে বলিয়া উঠিবেন, জীবনকে সত্য করিয়া দেখিবার স্থান জুটিল কি ওই নিষিদ্ধ পল্লীতেই ?

তা'র কারণ আছে। প্রথমতঃ, জীবনকে যে কোথায় দেখিতে হইবে, কোথায় না, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। সুবিধার গণ্ডীটাই চিরকাল সত্যের গণ্ডী নয়, জীবনেরও নয়। কল্পসাহিত্যিক আপনার জীবনের দেখা দিয়াই সত্যের মন্দির গড়িয়া তোলেন। এতকাল চোক বুজিয়া প্রথাগত বুলি আওড়াইয়া কাল্পনিক-পতিতাকে দাঁড় করাইয়া তাহাকে খুব শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, আজ বাস্তবের পতিতা যদি ততটা শাস্তি লইতে না রাজি হয়, তাহা হইলে উপায় কি ?

বর্ত্তমান যুগে ওই যে হীন, হেয়, পতিত, ইতরকে লইয়া কল্পসৃষ্টি চলিয়াছে, তাহার আরো একটা কারণ আছে। গ্রীকসভ্যতার মর্ম্মরপ্রাসাদ নাকি গড়িয়া তোলা হইয়াছিল বর্ব্বর দাসত্বের ভিত্তির উপর, ইউরোপীয় সভ্যতাও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে দুর্ব্বল জাতির দাসত্বের উপর, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মও বর্ত্তমান যুগে দাঁড়াইয়া আছে নিম্নজাতির হীনতার উপর। এই যে পরকে ছোট করিয়া রাখিয়া তাহারই উপর আপনার মহত্ত্বকে গড়িয়া

তোলা—এ কোন কালেই থাকে নাই, থাকিতে পারে না। বিশ্বময় তাই তাহার মরণ-ডঙ্কা বাজিয়াছে। তেমনি যুগ যুগ ধরিয়া পতিতার উপর দাঁড়াইয়া আছেন সমাজ-শুচিতা। অনেকে যুক্তি দেন, ইহা হইতে বাধ্য। একশ্রেণীর পতিতা না থাকিলে সমাজই চলিবে না। কল্যাণের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য অকল্যাণকে স্বীকার করা চাই। বর্ত্তমান যুগের আত্মা ইহাকে অস্বীকার করিয়াছে। মানুষকে ঘৃণা করিয়া মানুষ ভাল হইবে, বড় হইবে, এর চেয়ে অপমানজনক পন্থা আর কিছুই নাই, ইহাই বর্ত্তমান যুগের সিদ্ধান্ত। তাই আজ যারা ছোট, যারা হেয়, তারা সমান হইতে চায়—জীবনযাত্রীর সমান অধিকার তাহার। তাহাকে স্থান দাও।

* * *

ইহার অর্থ এই নহে যে, যে ছোট সে আজ আপনাকে বড় বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়। তবে প্রতিক্রিয়া চিরকালই আতিশয্যের পথ দিয়া চলে। পতিতাকে ঘৃণা করিতে গিয়া একদিন সাহিত্যিকেরা যেমন মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তেমনি যদি বিপরীত দিকেও কিছু মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তাহাতে হাহাকার করিবার, জগৎটা পাপের পথে সরাসর নামিয়া যাইবে, আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না বলিয়া ভয় করিবার কিছু নাই। এই মাত্রাধিক্যের পশ্চাতে যে সত্য রহিয়াছে, তাহাকে তা' বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সত্যটি এই যে, পতিতাও মানুষ; নানা অবস্থার নিষ্পেষণে সে আজ পড়িয়াছে; সে পতন তাহার অশক্তি বটে, কিন্তু পাপ নহে, গুরুতর অপরাধ নহে।

সমাজে নানা শ্রেণীর লোক আজ নানাভাবে অধঃপতিত। তাহাদের অধঃপতনকে যখন কেহই গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করেন না, তখন এই পতিতাকেও ভয়ানক পাপী বলিয়া মনে করিবার বিশেষ যুক্তি নাই। অপরাধতত্ত্বের আলোচনায় একথা বোধকরি স্বীকার্য্য যে, স্বভাবগত অপরাধ

জগতে খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যত কিছু অপরাধ তাহার অধিকাংশই মানুষ বিশেষ অবস্থার চাপে করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং আজ পতিতার অপরাধকে যদি গুরুতর বলিতে হয়, তবে সেই গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ী মানুষ সমগ্রভাবে; সমাজ ও শাসনতন্ত্র তাহার জন্য দায়ী।

অনেকে বলেন সমাজ তো পাপ করিতে বলে নাই। যাহারা পতিতা, তাহারা পাপ করিয়াছে বলিয়াই দণ্ডভাগিনী। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহারা পতিতা, তাহাদের পতনের জন্য পুরুষের সহকারিতার কোন প্রয়োজন আছে কিনা; আর যে নারী চিরকালই স্বভাবভীরু, তাহাকে দুষ্কর্ম্মের দুঃসাহসিক পথে প্ররোচিত করিতে পুরুষের প্রবল প্রেরণারই বেশী দায়ী কিনা? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে পতিতার যে বহিষ্কার এবং অস্পৃশ্যতাদণ্ড, তাহা পুরুষকেও দেওয়া হয় না কেন?

এসব কথার পরে, সব কথাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বলিতে হয় যে, পতিতা-সমস্যা বলিয়া কোনো সমস্যাই নাই। সমাজ-বিবর্ত্তনের অনিবার্য্য নিয়মে নাকি যাহার যেমন হওয়ার প্রয়োজন সে তেমনি হইয়াছে। জগতে পতিতা না হইলে সমাজ থাকিবে না। আর পতিতার জন্য মাথা ব্যথারই বা প্রয়োজন কোথায়? তাহারা তো বেশ আছে। এই মোটা কথাকয়টিকে বেশ দাশনিক করিয়া বলিবার প্রবৃত্তি কোথাও কোথাও দেখা যায়।

যাহা যেমন আছে তাহা বেশ আছে, বেশ না হইলেও তাহাই হইতে বাধ্য—এসব কথা ঘোরতর অদৃষ্টবাদীর পক্ষেই সম্ভব, আর সে রকম খাঁটি অদৃষ্টবাদী একমাত্র জড়-জগতেই পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত কোনো অদৃষ্টবাদী ভাত আপনি মুখে আসিবে, আপনি তাহা চর্ব্বিত হইয়া গলা দিয়া গলিয়া যাইবে, এমন সিদ্ধান্ত লইয়া চলেন নাই। সুতরাং মানুষের জীবনের স্বাভাবিক কথা হইতেছে এই যে, যাহা যেমন আছে তাহার তেমন

থাকা উচিত নহে। যাহা কিছু অশোভন, অসঙ্গত ও অন্যায়, তাহার সম্বন্ধে কেবলি সচেতন হইয়া চলা, ইহাই জীবন। যে আজ পতিতা, সে হয়তো নিজের অবস্থা আজও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে সচেতন করিবার প্রয়োজন কি আর কাহারও নাই? চোর যখন চুরি করে, তখন তো তাহাকে ভাল করিবার দায়িত্ব সমাজ এবং শাসনতন্ত্র উভয়েই অনুভব করেন। তাহাকে তো এই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় না যে, সে আপনি যেদিন সচেতন হইবে সেই দিনই তাহার চেষ্টা সত্য হইবে? সুতরাং সমস্যার জাগরণের জন্য পঞ্জিকা দেখিবার কোনো প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে যে, যে অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সে অবস্থা অবাঞ্ছিত কিনা। এই যে সমাজে পতিতার একটা ঘৃণিত স্থান, ইহাকে প্রয়োজন বলিবার লজ্জা হইতে আজ মানুষ ত্রাণ পাইতে চায়, তাই সে পতিতাকে তাহার অন্ধকার ও দুর্দ্দশা হইতে উঠাইয়া আনিয়া মানুষের মর্য্যাদা ও স্থান দিতে চাহিতেছে; পতিতা-সমস্যার এই মূল কথাটি কি অস্বীকার্য্য?

* * * *

ফল-কথা, বর্ত্তমান যুগ মানবচরিত্র বিচারের পদ্ধতিটিকে একটু পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছে। ত্রিশ বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলেই সংসারধর্ম্মের গুরুতর দায়িত্ববোধ করিয়া যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন, সমাজ তাঁহাদিগকে ব্যভিচারী বলিবেন না, কিন্তু যদি কোনো পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা অন্য কাহারো প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলেই তাঁহাকে একেবারে নরকস্থ করিতে হইবে, এই মনোভাবকে বর্ত্তমান যুগ বরদাস্ত করিতে পারিবে না। শক্তিশালী পুরুষের এই যে জবরদস্তি, ইহা দীর্ঘকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। পুরুষের পতনকে ঢাকিয়া রাখিবার এবং তাহাকে নানাভাবে ধর্ম্মসম্মত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু নারীর কোনই ব্যবস্থা নাই। এমত অবস্থায় তাহার একটু ত্রুটিই তাহার জীবনকে চরম দুর্দ্দশার পথে

টানিয়া লইয়া চলে। বর্ত্তমান যুগ সমাজ-ব্যবস্থাকে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে আহ্বান করিতেছে এবং সেই প্রেরণারই ফলে কল্প-সাহিত্যিক এই ঘোরতর অন্যায়ের দিকে দরদ দিয়া দৃষ্টিপাত করিবার জন্য পাঠককে শিক্ষা দিতেছেন।

সমাজের উপর তলায় থাকিয়া যাঁহারা কেবলি নীচের-তলার হাওয়া হইতে আপনাদের বাঁচাইবার জন্য চীৎকার করিয়া মরিতেছেন, তাঁহাদের এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, ওই নীচের তলাকে ভাল না করিয়া তাহাকে বাদ দিয়া রাখিবার কোনই উপায় নাই। সমাজের জীবনের প্রত্যেক অংশের জন্য অপর অংশ দায়ী। তাহার ভাল এবং মন্দ দুইই সমগ্র সমাজ-জীবনের ফল।

সমালোচনার কথা

সম্যক্ দৃষ্টি না থাকিলে সম্যক্ আলোচনা হইবে কি করিয়া? অথচ এই সম্যক্ দৃষ্টি বস্তুটি জগতে কতই না দুর্লভ! যে জগতের মধ্যে মানুষ বাস করে সে জগৎ অসীম বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ; সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে মানুষ এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার অনুভব ও জ্ঞানকে পরিস্ফুট করিবার ক্রমাগত প্রয়াস পাইতেছে। এই অসীম রহস্য-পরিপূর্ণ জগতে যতটুকু তাহার নিকট ধরা দিতেছে, ততটুকু অনুভব এবং জ্ঞান লইয়া সে তাহার অন্তর্জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। আর সেই অন্তর্জীবনের রূপখানি তাহার ধর্ম্মে ও সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

এই জন্যই সাহিত্যকে কোন সমালোচক জীবনের সমালোচনা বলিয়া অভিমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই যে বিচিত্র রহস্যময় জীবন আপনাকে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রকাশ করিতেছে, প্রত্যেক মানুষ তাহার কতটুকু বা অনুভব করিতে পারে? কতটুকুই বা দেখিতে পারে? তবু যতটুকুই সে দেখে, ততটুকু লইয়া সে একটা সমগ্রতার ধারণা করিতে প্রয়াস পায়। সাহিত্যসৃষ্টি তাহার এই জীবনকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস। সাহিত্যের মধ্যে তাই পাই সাহিত্যিকের জীবন সম্বন্ধে অনুভব এবং জ্ঞানের প্রকাশ। সাহিত্যিকের দৃষ্টিশক্তির তীব্রতা ও গভীরতা তাঁহার জীবন-অনুভবকে, তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়মিত করে। এই জন্যই সাহিত্যকে জীবনের সম্যক্ আলোচনা না বলিতে পারিলেও, জীবনের আলোচনা নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায়।

সৎ-সাহিত্য অথবা সত্য-সাহিত্য সৃষ্টির মূলে তাই সত্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে। কোন্ সাহিত্যিকের সত্যদৃষ্টি আছে এবং কাহার নাই—ইহা লইয়া তর্ক যতই থাকুক্, সত্য-দৃষ্টি এবং মিথ্যা-দৃষ্টি বলিয়া যে দুইটি স্বতন্ত্র রকমের দেখা আছে, তাহা লইয়া কাহারো কোন তর্ক থাকিতে পারে না। সুতরাং দৃষ্টিবিকারের ফলে বিকৃত সাহিত্যরচনা যে হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন একটি আলোচনা—জীবন ও জগতের উপর একটি মন্তব্য। যুগে যুগে, দেশে দেশে ব্যক্তির পর ব্যক্তি মন্তব্যের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে; দৃষ্টিভেদের অনন্ত বৈচিত্র্য ও তারতম্যকে মানুষ তাহার জীবনে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে ফুটাইয়া চলিয়াছে।

এই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ যে-জীবনের, তাহা যদি কোনো মৌলিক সত্যের, কোনো শাশ্বত সত্যেরই প্রকাশ হয়, তাহা হইলে এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোথাও-না-কোথাও একটি সমন্বয়ের—সামঞ্জস্যের—সুসঙ্গত অর্থের সম্ভাবনা কল্পনা না করিয়া পারা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন লইয়া আলোচনা করিলেও তাহার মধ্যে সমন্বয়চেষ্টা পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানব তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে একটি মাত্র অর্থের পরিপূর্ণতা দিয়া ভরিয়া তুলিতে চায়, নানা বর্ণে ও রূপে সে তাহার জীবন-শতদলকে বিকশিত করিয়া তুলিতে চায় সত্য, কিন্তু তাহার মর্ম্মকোষে সে একটি মাত্র বিশেষ মাধুর্য্যকে, বিশেষ রসকে সঞ্চিত করিয়া তুলিতে থাকে।

জীবনমাত্রই এই সমন্বয় সাধনের, সুরসঙ্গতির একটি বিশেষ প্রয়াস—সত্যদৃষ্টিকে পাওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা বলিয়া মনে হয়! যে পরিপূর্ণ সত্য পরম ঐক্যে বিধৃত হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যে আপনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে, সেই সত্যের সহিত প্রত্যেক জীবন আপনার ছন্দ মিলাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু কি দেখিতে পাই? সুর মিলে না, ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বের আলোক

বাতাসের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না; তাই জীবনে কত বিশৃঙ্খলা, কত বেসুর, কত দ্বন্দ্ব!

কিন্তু জীবনের সবখানি ক্ষেত্রেই যদি কেবল অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যায় হইত, তাহা হইলে যে সত্যের মৃত্যু হইত, সত্যের প্রকাশ-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত! এই ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে কখনো কখনো কোথাও কোথাও সত্যের চকিত চমক দেখা যায়, মুহূর্ত্তের জন্য অকস্মাৎ দিব্যদর্শন হইয়া যায়, অনন্ত জীবনের আলোকে খণ্ডিত জীবনখানি আলোকিত হইয়া উঠে। যে-সব সাহিত্যিক ও শিল্পী, কবি ও সাধকের মধ্যে এই দিব্যদর্শন ঘটে, তাঁহারাই জীবনের সত্য আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে মানবসমাজ চিরকাল ঋষি বলিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁহারা জীবনের আলোচনাই শুধু করেন নাই, তাঁহারা জীবনের সমালোচনাও করিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কিন্তু সমালোচক নামে একদল লোক চলাফেরা করেন, তাঁহাদের উপর আজকাল অনেকেরই রোষদৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিতে পাই। সমালোচক না বলিয়া যদি ইঁহাদিগকে শুধু আলোচক বলিয়াও মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও অনেকেই ইঁহাদিগকে সাহিত্যের আসরে স্থান দিতে নারাজ। হয় ত কোথাও কোথাও কোনো কোনো আলোচক তাঁহাদের অহমিকা এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আলোচনার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তা বলিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে আলোচকের কোনোই স্থান নাই, শুধু স্থান রহিল যে-কোনো রকমের সাহিত্য-স্রষ্টার, এ কথা মানিয়া লই কেমন করিয়া,—তাহাও ভাবিয়া পাই না।

পূর্ব্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সাহিত্যস্রষ্টাও একজন আলোচক; তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টি এবং মনো-

ভাবটিকে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যটিকে প্রচার করেন। এইজন্য আলোচক হিসাবে স্রষ্টা এবং তথাকথিত সমালোচকের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। স্রষ্টা তাঁহার কল্পনার মায়া দিয়া তাঁহার মন্তব্যটিকে রূপে ও রেখায়, গল্পে ও গানে প্রকাশ করিয়া অন্যের চিত্তকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করেন, সমালোচক এই কল্পসৃষ্টির জগতের সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি-লব্ধ জগতের তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া থাকেন; সমালোচক কিছু সৃষ্টি করেন না, বিশেষ বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টিকে সত্যের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণের প্রয়াস পান মাত্র। সুতরাং স্রষ্টাকে যদি সৃষ্টির অধিকার দিতে আমাদের কোনো আপত্তি না থাকে, সাহিত্য-সমালোচককেও আলোচনার সম্পূর্ণ অধিকার দিতে আমাদের অরুচি ঘটিবার কোনো কারণ নাই।

বরং ভাবিয়া দেখিতে গেলে, সমালোচকের একটি বিশেষ স্থান এবং প্রয়োজন আছে, ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

জীবন ও জগতের সত্য সম্বন্ধে কোনো কোনো মানুষের মধ্যে একটি সহজ অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ যে না ঘটে, তাহা নয়। ইঁহারা যেন ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা সত্যকে লাভ করেন। যদি কোনো সাহিত্যস্রষ্টা এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি যে সত্য সৃষ্টি হয়, তিনি যে সত্য সমালোচনা করিতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সত্যানুসন্ধানের আরেকটি পন্থা আছে, সেটি অভিজ্ঞতার (experience) পন্থা। সাধারণ সাহিত্য-সমালোচক কোনো ধ্যান-দৃষ্টির অধিকার অর্জ্জন না করিয়াও বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা একটি সত্যকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান যেমন ধ্যানদৃষ্টির অপেক্ষা না করিয়াই কেবল বহু বিচিত্র তথ্য-সংগ্রহের পর তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশ্বসত্যকে আবিষ্কার করেন, সমালোচকও তেমনি

সাহিত্যক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা-মূলক পন্থা ধরিয়া সাহিত্য-সমালোচনার কষ্টিপাথর আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন।

কোনো বিশেষ সাহিত্যিকের সৃষ্টি তাঁহার বিশেষ মনোভাবের মধ্যেই আবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টির দিকে চাহিয়া, তাঁহার বিশেষ মনোভাবের পরিচয় পাইলেও, সেই সৃষ্টি বিশ্বজনীন সত্যের অথবা বহু সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে সমন্বয় রহিয়াছে তাহার সহিত কতটা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। এখানে সমালোচক যে কাজের ভার লইয়া অগ্রসর হন, তাহা অত্যন্ত গুরুতর এবং কোনো বিশেষ সাহিত্যিকের আলোচনা হইতে তাঁহার সমালোচনার মূল্য বেশি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবনের মূলে একটি নিগূঢ় ঐক্য রহিয়াছে। সেই ঐক্যের দিক দিয়া জীবনকে না দেখিতে পারিলে তাহাকে সত্য করিয়া দেখা হয় না, জীবন শুধু সামঞ্জস্যহীন বিচ্ছিন্নতায় পর্যাবসিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সেই সত্যটিকে আবিষ্কার করিতে না পারিলে, একই ব্যক্তির বিভিন্ন কালের সৃষ্টির মধ্যে পর্য্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। স্রষ্টার সৃষ্টির পক্ষে আপনার এই অখণ্ড আত্মপরিচয় নিতান্ত প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু যদি আত্মপরিচয়ের দায় থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেও সমালোচকের শরণ লইতে হইবে অথবা সমালোচকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমালোচক কোনো সাহিত্যিকের বিভিন্ন সৃষ্টির আলোচনা করিয়া যেমন তাঁহার একটি অখণ্ড পরিচয় (যাহা তাঁহার নিকটও হয় তো গোপন এবং অজ্ঞাত) আবিষ্কার করিতে পারেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে পরিচয় প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহাও আবিষ্কার করিতে পারেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালী-জাতির একটি প্রকৃতি ও সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা এক সময় বাঙ্গালীর জ্ঞান এবং বুদ্ধির নিকট নিতান্তই অগোচর ছিল। সমালোচক

আসিয়া যে দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেন সে দিন হইতে বাঙ্গালীর আত্মস্বরূপের অন্ততঃ কতকটা পরিচয় পাইতে পারিয়াছে। তাই সুদূর বৈষ্ণবযুগের অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত এই বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের মর্ম্মগত স্বরূপের যোগ কোথায়, তাহা বাঙ্গালী বুঝিতে পারিতেছে। জাতীয় উন্নতি ও বিকাশের পথে এই জাতিগত পরিচয়ের মূল্য কতখানি তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সমালোচকের প্রয়োজনকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন না।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্রমবিকাশের পথে এই সমালোচনার মূল্য কতখানি, তাহা আমরা সব সময় ভাবিয়া দেখি না। কিন্তু অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার সমালোচনা দ্বারা মানুষ যে অতীতের সোপান অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের পথে উঠিয়া যায়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। শৈশব হইতে মানুষ তাহার জ্ঞানবুদ্ধিকে, তাহার কর্ম্ম এবং কল্পনাকে, কেবলি মার্জ্জিত করিয়া চলিয়াছে এই অতীতের সমালোচনা দিয়াই। সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ যে বহুল পরিমাণে এই আলোচনার সহায়তায় হইয়া থাকে, তাহারও প্রমাণ সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন। বহুল আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে বিস্তর আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িতেছে, এই ভয়ে যাঁহারা ইহার নির্ব্বাসন কামনা করেন, তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ মনে করিতে পারা যায় না। কারণ, একমাত্র আলোচনার দ্বারাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, তাহার বিচারশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতে থাকে এবং এইরূপ আলোচনার ফলে শ্রোতা এবং পাঠকের মন যখন অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া উঠে, তখনই সেখানে গভীরতর সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদ আসে। স্রষ্টা যেমন তাঁহার অনুভব ও বিচারের দ্বারা পাঠকের মনকে উচ্চগ্রামে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তেমনি উন্নত শ্রেণীর পাঠক এবং শ্রোতার অস্তিত্বই গভীরতর ও বিশালতর সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা

জাগাইয়া বড় সাহিত্যিক এবং শিল্পীর জন্মকে সম্ভব করিয়া তোলে।

নব্য বাঙ্গালা-সাহিত্যের উগ্র সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোনো কোনো চিন্তাশীল লেখক সমালোচক শ্রেণীকে নরকস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাগণের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। তাহা না করিয়া যদি ইঁহারা সত্যকার সমালোচনার কাজে হাত দিয়া নব্য-সাহিত্যের একটা যথাযথ মূল্য নিরূপণের সংযত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আলোচনার মূল্য বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়।

জীবন ও শিল্প

বিশ্বপ্রবাহের দিকে চাহিয়া অবাক্ বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যে দিকেই চাহিলাম, দেখিলাম এক বিরাট্ অন্ধ আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের অদ্ভুত লীলা। অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া কত সৌরজগৎ, কত গ্রহনক্ষত্র দেখিলাম, —সর্ব্বত্রই এক বিপুল চাঞ্চল্যের স্পন্দনে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি স্পন্দিত হইতেছে। এ যেন এক অকারণ ভাঙাগড়ার খেলা, ইহার ভাঙাও যেমন উদ্দেশ্যহীন, গড়াও তেমনি; কে যে ইহার নিয়ন্তা, কে যে ইহার নিয়ামক—তাহাই বুঝিতে না পারিয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছিলাম। তারপর আবার দেখিলাম ইহা জড়-জগতের একটা অন্ধশক্তির উচ্ছৃঙ্খল বিলাস নয়; সর্ব্বত্রই এক বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্ফুরণের আভাস পাইলাম। যেখানে শুধুই জড়নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম প্রাণ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে; প্রাণময় জগতের এক পরমাশ্চর্য্য দৃশ্য তখন চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। কত কোটি বৎসরের কত না ভূস্তর ভেদ করিয়া, চেতনার কত না স্তরে, ধাপে ধাপে উঠিয়া-আসা দেখিতে পাইলাম; তাই জড়-চেতনার ভেদ আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে, সর্ব্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট প্রাণের বিকাশ-চেষ্টা আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রাণ ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে গতিচাঞ্চল্য আনিয়াছে, সেই প্রাণই আবার মানুষের মধ্যে কত না চিন্তায়, কত না ছন্দে ও ভঙ্গীতে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে।

আজ বুঝিতেছি কত অনন্তকালের বিপুল ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষার পথ বাহিয়া প্রাণ চেতনার পথে, কত ধীরে, কত শঙ্কিত-সর্পিল গতিতে, কত আঁক-বাঁক বাহিয়া শুধুই সম্মুখের পানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আসিতে আসিতে সেই গূঢ় প্রাণ-চৈতন্য যেন মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রীভূত ও

সংহত হইয়া, সচেতন হইয়া আপনার দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিয়াছে। সেই জন্যই বিশ্বপ্রাণ মানবের মধ্যে আসিয়া আপনার ভাষাটিকে পাইয়াছে, মানুষের চেতনাঘন রূপ ধরিয়া সর্ব্বপ্রথম সে যেন আপনার ধর্ম্মের সহিত, মর্ম্মের সহিত, আপনার প্রয়োজনের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু তা বলিয়া এ কথা বলিতেছি না যে, মানুষের রূপ ধরিয়া একদিনেই বিশ্বপ্রাণ আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে। যুগ-যুগান্ত যে-প্রাণ মানবেতর সৃষ্টির মধ্যে ভ্রূণরূপে পরিণত হইতেছিল, আদি মানবের মধ্যে তাহা নিতান্তই শিশুর মত আকাশ-আলোক-বাতাসের সহিত পরিচয় পাতাইতে বসিয়াছিল; তখনো তাহার মধ্যে ভাষা ফুটে নাই, একটা অস্ফুট ক্রন্দন শুধু দিনরাত এই সম্ভাবনাটিকে আনন্দের সহিত বিশ্বজগতে প্রচার করিতে লাগিল যে, প্রাণশিশু কথা কহিবে, সে বোবা হইয়া আসে নাই। যে-কথা তাহার বলার, যে-লক্ষ্য তাহার চলার, তাহাকে দু'হাত বাড়াইয়া সে শুধু ধরি-ধরি করিতেছে, কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না। মানবের এই প্রথম অবস্থাটা এই জন্যই একটা দ্বন্দ্বের অবস্থা—যুগ-যুগান্ত-অভ্যস্ত মূঢ় মূক চেতনার সহিত আত্মচেতনার—আত্মবোধের এ এক বিপুল সংগ্রাম। প্রতি শিশুকেই এই সংগ্রাম জয় করিয়া ভাষার দুর্গটিকে অধিকার করিতে হয়।

সংগ্রামের সময় যেমন সংগ্রামের উপায়টাই প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়, মানুষের প্রথম অবস্থায় তেমনি তাহার উপায়টিই উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তখন কয়লা, জল আর আগুন সংগ্রহ করাটাই জীবনের চরম প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, তা ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনেই হয় না। তখন মনে হয় বাঁচিয়া থাকাটাই হইতেছে সবার সেরা প্রয়োজন, ইহার বাড়া, ইহা ছাড়া আর কোনো কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না।

যতদিন পশু-জীবনের মূঢ় চেতনার সহিত মানবের আত্মচেতনার এই বিরোধ চলিতে থাকে, যতদিন ওই আবরণ সে কাটাইয়া উঠিতে না পারে, ততদিন ইহাই মনে হয়, বাঁচিয়া থাকাটা আহার অন্বেষণে আর গ্রহণেই সার্থক, অন্য কিছুতেই বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা নাই। এই পাশব চেতনার আবরণ কিন্তু কাটিয়া যায়; যে মর্ম্মান্তিক সন্ধানের টানে প্রাণ লক্ষ কোটি বৎসরের ভূস্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে, সেই সন্ধানই তাহাকে আত্মচেতনার ক্ষেত্রে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে; তখন প্রাণের যে কি লক্ষ্য, তাহাও স্পষ্ট না হইয়া পারে না।

মানুষের মধ্যেই প্রাণ আসিয়া যেন আত্মচৈতন্যকে লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই; এই জন্যই মানবপ্রাণের পরম প্রয়োজনের মধ্যে বিশ্বপ্রাণের চরম গতির ইঙ্গিত পাই—মানুষ যে বিশ্বপ্রাণেরই মূর্ত্তরূপ। সুতরাং এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব, মানব-জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহার সত্যকার প্রয়োজন কিসে।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবনমাত্রই একটা চেতন-গতি। বিজ্ঞানের নিকট শুনিতে পাই যে, গতি মাত্রই একটা বাধাকে ডিঙাইয়া যাওয়া। আকাশে যদি বায়ু-স্তরটিও না থাকিত, পাখীর পাখা তাহা হইলে চিরতরে স্তব্ধ হইয়াই যাইত, পায়ের নীচে মাটীর বাধা না থাকিলে মানুষ জড় না হইয়াও অচল হইয়া থাকিত। অনুভবের দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, জীবনও এমনই একটা বাধা পরম্পরার অতিক্রমণ মাত্র। যেখানে যেখানে জীবন-চেতনা, সেখানেই দেখি একটা না একটা বাঁধনের অনুভব এবং এই বাধা-বাঁধনকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার চেষ্টা। প্রতি মানব-চৈতন্যের মধ্যেও জীবনের এমনই একটা বদ্ধতার অনুভূতি দেখিতে পাই।

কিন্তু তা' বলিয়া কেহ যদি বলিয়া বসেন যে, সুতরাং জীবন মানে বদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহা হইলে তিনি বিষম ভুল করিবেন। জীবন

বদ্ধতাকে ছাড়াইয়া জয় করিয়া যাওয়ার চেষ্টা; ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, জীবন হইতেছে স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে সার্থক, ভূমার বিস্তৃতির মধ্যে সে সার্থক, বন্ধনে-জড়তায় নয়। সেই জন্যই 'ভূমৈব তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি' বলিয়া মানবপ্রাণ অনন্তকাল ধরিয়া কাঁদিতেছে।

এই বন্ধনকে জয় করিতেই যখন হইবে, তখন দেখা চাই এই বন্ধন কোথায়? মানব-জীবনের বন্ধন কোন্‌খানে? দেখিতে পাই, তিন দিক্ হইতে এই বন্ধন-সয়তান মানবপ্রাণকে স্বচ্ছন্দতাহীন করিবার চেষ্টা করিতেছে; সেই তিনটি হইতেছে অজ্ঞানের বন্ধন, অশক্তির বন্ধন এবং অনুভব-সঙ্কীর্ণতার বন্ধন। মানুষ চায় জ্ঞানের সর্ব্বভেদী দৃষ্টি, ইচ্ছার সর্ব্ব-বিজয়ী শক্তি অর্থাৎ কর্ম্মে অবাধ আত্মপ্রতিষ্ঠা আর অনুভবের সর্ব্ববোধ বা বিশ্বযোগ। কিন্তু অজ্ঞান তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে, অশক্তি তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখে, অনুভবের অভাব তাহাকে বদ্ধ ও বিযুক্ত করিয়া রাখে।

অজ্ঞানের অবস্থাটি যে মানবের মধ্যে প্রস্তরের অ-জ্ঞান বা জ্ঞানের অত্যন্তাভাব নয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। তাহার অজ্ঞান হইতেছে অস্পষ্ট জ্ঞান। এই অস্পষ্ট জ্ঞান আমাদিগকে পীড়া দেয়, চিন্তার ধারার সঙ্গে আমাদের অনুভবগত সত্যের গরমিল থাকে বলিয়া প্রাণ কিছুতেই শান্ত হইতে পারে না। কোনো একটি বৃহত্তর সত্য যেন তাহার মনীষাকে উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, তাহার সহিত সত্যকার যোগ স্থাপন করিয়া, তাহাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুক্তি দেয় না। সেইজন্যই প্রাণ পীড়িত হইয়া উঠিতে থাকে; কেবলই বিরোধের ক্লান্তি জমিয়া উঠিয়া চিত্তকে বদ্ধতা ও মুক্তি-হীনতার মধ্যে চাপিয়া ধরিতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের অস্পষ্টতা কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরে এই ইঙ্গিতটিই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে, যেন আমাদের সহিত বাহিরের অনন্ত সত্যের কোথায় পরম আত্মী-য়তা রহিয়াছে, ভূমার সহিত আমাদের মননের যেন কোথাও বিরোধ নাই।

মননগত জ্ঞান আমাদিগকে ভূমার এইটুকু ইঙ্গিত দিয়াই নিরস্ত হয়। সে শুধু একটা দিক্ নির্দ্দেশ করে মাত্র, লক্ষ্যের সত্যকার স্বরূপ সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে পারে না।

কর্ম্মের মধ্যে আবার আমাদের জীবনের ইচ্ছার দ্বন্দ্বটি দেখিতে পাই। কর্ম্মের লক্ষ্য কোনো বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হোক বা না হোক, কর্ম্মের এতটুকু লক্ষ্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের শক্তিকে অনুভব করিবার চেষ্টা করি। যেখানে আমাদের কর্ম্ম যত অপ্রতিহত, সেখানে আমাদের কর্ম্ম ততই সার্থক। যে কর্ম্মে এতটুকুও অশক্তি আমার কাটিয়া যায় তাহাই আমার কর্ম্ম, আর যাহা কিছু সবই অ-কর্ম্ম। কর্ম্ম করিতে গিয়া জানিয়া হোক, না-জানিয়া হোক, আমরা একটা বহিঃশক্তিকে স্বীকার করিয়া লই। কর্ম্মে যখন সফলতা আসে তখন স্বীকার করিতে হয় যে, সে-শক্তি আমার শক্তি হইতে ক্ষুদ্র কিম্বা সে-শক্তি আমার সহায়। বহিঃশক্তি যে মানবের সীমাবদ্ধ শক্তি হইতে বিপুলতর তাহা বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। একদিন না একদিন এ কথা বুঝিতেই হয় যে, মানবীয় শক্তি সেই বিরাট্ শক্তির অনুগত হইয়া চলিয়াই স্বয়ং বিরাট্ ও বিপুল হইতে পারে। সুতরাং ইচ্ছার দিক্ দিয়াও জীবন সার্থক হয় সেদিন, যেদিন মানুষ আপনার ইচ্ছার সহিত অজ্ঞাত ইচ্ছাব আত্মীয়তা স্থাপন করিতে সক্ষম হয়।

জ্ঞান যাহার ইঙ্গিত করে, কর্ম্ম যাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে আমাকে বাধ্য করে, সেই ভূমার সহিত, বিরাটের সহিত একান্ত একাত্মকতা যদি সত্য ও সম্ভব না হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইই নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইত। কারণ আত্মীয়তা পাতাইয়া আমার যতই সুবিধা ও শক্তি লাভ হোক না কেন, সে যদি নিতান্তই পর হয়, যদি পাতানো আত্মীয়তা শুধু আপনার ক্ষুদ্রতা ও দীনতারই একটা নিদর্শন মাত্র হয়,

তাহা হইলে সে আত্মীয়তার তক্‌মা গলায় বাঁধিয়া বাঁচিয়া থাকার মত মর্ম্মন্তুদ আর কিছুই হইতে পারে না। ঋষি কার্পেণ্টার তাই বলিতেছেন,—

"If that which rules the universe were alien to your soul, then nothing could mend your state—there were nothing left but to fold your hands and be damned everlastingly."—*Towards Democracy*.

কিন্তু জ্ঞানই বল আর কর্ম্মই বল, উহারা কেহই এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলে না যে, বাহিরের এই বিপুলতা, এই অসীমতা তোমারই আত্মার চরম প্রকাশ, উহা তোমা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বাহিরের কিছুই নয়।

মানবের অনুভূতি-মূলক উপলব্ধি আসিয়া তাহাকে এই পরম প্রার্থিত সত্যটি দেখাইয়া দেয়। অনুভূতি দেয় একটা পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ; যাহা ভূমা, যাহা অসীম, তাহা যে অন্তরাত্মারই পরম স্বরূপ, অনুভব আসিয়াই তাহা দেখাইয়া দেয়। অনুভূতির মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, অনুভূতি আমাদিগকে দেয় রূপ-সাক্ষাৎকার। অনুভূতির মুহূর্ত্তের প্রধান লক্ষণই হইতেছে অহংবিস্মৃতি, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ মগ্নতা বলিয়া থাকি। যে-আমিত্বের গণ্ডীটুকু টানিয়া লইয়া মানব বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং সহস্র বিরোধের কেন্দ্র হইয়া উঠে, অনুভবের মুহূর্ত্তে সেই অহংসীমার লোপ পাইয়া অহংবোধ কোথায় মগ্ন হইয়া যায়; অথচ এই অহং-লোপের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চৈতন্য লুপ্ত হইয়া জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে না; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে অনুভূতির after-effect বা রেশটুকু স্মৃতির তটে ঘা মারিতে পারিত না। এই কারণেই স্বীকার করিতে হয় যে, অহং-লোপের দ্বারা মানুষ আপনাকে একান্তভাবে হারাইয়া ফেলে না, বরং সে আপনার এমন একটি বিশাল স্বরূপের উপলব্ধি করে, যাহাতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের, আমি-তুমির দ্বন্দ্ব কাটিয়া যায়। অনুভূতির মুহূর্ত্তকে এক দিক্‌

দিয়া যেমন অহংলোপের মুহূর্ত্ত বলিতে পারি, অপর দিক্ দিয়া তেমনি উহাকে তন্ময়তার মুহূর্ত্তও বলিতে পারা যায়। যেখানে তন্ময়তা নাই, সেখানে সত্যকার অনুভূতিও নাই। যেখানে তন্ময়তা, সেখানে বদ্ধতার লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। অনুভূতির দ্বারাই মানবপ্রাণ ভূমার সহিত, অসীমতার সহিত তন্ময়তা লাভ করে, তাদাত্ম্যতা প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই বলিতে হয়, অনুভূতি মানব-প্রাণকে অসীমতার ক্ষেত্রে মুক্তি দেয়, অসীমতাই যে তাহার অন্তরাত্মার সত্যস্বরূপ, ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রত্যক্ষদর্শনকে বস্তু-সাক্ষাৎকার বলিতে হয় বল, রসরূপ বলিতে হয় বল, ইহাই মানবাত্মার চরম লক্ষ্য; মানব-প্রাণ ইহারই সন্ধানে ঘুরিয়া মরে।

মানব-প্রাণে এই অনুভব অকস্মাৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসে না। আলম্বন বিনা প্রাণে ভাবের উদ্বোধন হয় না, রসরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না। বাৎসল্য ভাবটি বস্তুতঃ অসীম রসস্বরূপ হইয়াও একটি শিশুকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে; সীমার নিবিড় সঙ্গ না পাইলে অসীমের আত্মপ্রকাশই অসম্ভব থাকিয়া যায়।

এইজন্যই দেখিতে পাই, এই ভূমার প্রকাশ যুগে যুগে দুইটি বিশেষ আলম্বন লইয়াই সম্ভব হইয়াছে। কখনো বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্যে, গন্ধে, গানে, কখনো মানব-জীবনের সুখ-দুঃখে, মান-অভিমানে, আশা-নিরাশা-বেদনায় ভূমা বিরাট্ হইয়া, অপরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে। এই রূপ যে দেখিয়াছে, সেই আপনার বাঁধনহারা হইয়া অন্তরের নিবিড় মুক্তিটিকে সত্য করিয়া অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে। উপলব্ধির পরম মুহূর্ত্তে মানব-চেতনায় কোনো কোনো আলম্বনকে আশ্রয় করিয়া এই অসীম রসরূপ সুপ্রকট হইয়া উঠে। এই অপরূপ রসরূপকে সত্যকার শিল্প বলিতে হয়। তাই সত্যকার শিল্পসৃষ্টি হয় মানবের নিগূঢ় মর্ম্মলোকে।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অসীমের আত্মপ্রকাশই বলি, আর মানবের মধ্যে তাহার স্বরূপদর্শনই বলি, যে-ভাবেই কথাটিকে প্রকাশ করি না কেন, উহা যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনকে নিমগ্ন করিয়া দেয়, তখন সেই ব্যক্তি শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়; শিল্পীর ভাবদৃষ্টির সম্মুখে তখন অপরূপের আবির্ভাব ঘটে এবং সেই আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ আলম্বনকে (medium) আশ্রয় করিয়া অনুভবের প্রাণময় স্পন্দনে ছন্দিত ও রূপায়িত হইয়া উঠে। এই রূপায়নই শিল্পসৃষ্টি।

এই শিল্পরূপটি কোন্ আলম্বনকে লইয়া প্রকট হইবে, তাহার কোনো নিয়ম নাই। শব্দে, বর্ণে, সুরে, স্থূল বস্তুসংস্থানে, গতিভঙ্গীর মধ্যে, কত ভাবেই এই রস আপনাকে রূপায়িত করিয়া তোলে। ব্যক্তিগত সংস্কার এবং সাধনার উপর এই আলম্বনের কথা নির্ভর করে। কিন্তু আলম্বন যাহাই হোক, প্রাণের সহজ-প্রকাশ যাহার মধ্যে পরম সত্য হইয়া উঠিবে, তাহাকেই সত্যকার শিল্প বলিব। ভাষার মধ্যে যখন এই অসীমের ব্যঞ্জনা হয়, তখনই সেই ভাষা শিল্প হইয়া উঠে। এই কারণেই যে-সাহিত্যে জীবনের নিবিড়তম ও গভীরতম উপলব্ধি প্রকাশ পায়, তাহাকেই মানব-সমাজ চিরকাল পরম সমাদরে মাথায় করিয়া রাখে।

এই যে জীবন তাহার নিম্নতম সোপান হইতে গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আকাশের অসীম আলোকের পানে চলিয়াছে, এ যাত্রা-পথের কোনোখানেই জীবন নিরর্থক হইয়া যায় নাই। এইজন্যই শিল্পীর দৃষ্টিপথে এই জীবনের কোন্ অংশ গ্রহণযোগ্য আর কোন্ অংশ গ্রহণযোগ্য নয়, এমন কোনো সমস্যাই জাগিতে পারে না। জীবনের যে-কোনো স্তরে, যে-কোনো বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃত শিল্পী জীবনের সত্যকার রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এই কারণেই সামাজিক সুরুচি-কুরুচি অথবা শ্লীলতা-অশ্লীলতা লইয়া শিল্পক্ষেত্রে কোনো বাদ-বিবাদ উঠিতে পারে

না। জীবন-যাত্রা-পথে প্রত্যেক বস্তুর একটি যথাযথ স্থান এবং অর্থ আছে ; জীবনের সমগ্রতার দিক্ হইতে জীবনের যে-কোনো রূপকে যখন শিল্পী দেখিতে পান, তখন জীবনের সেই রূপ আর অসম্পূর্ণ থাকে না। জীবনের বিকৃতির দ্বারাই শিল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। জীবনের এই বিকার শুধু যে দুর্নীতিগ্রস্ত মনের মধ্যেই সম্ভব হয় তাহা নয়, যে-কোনো নীতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেই জীবন তাহার অখণ্ডতা হারাইয়া ফেলে। কারণ, দৃষ্টি যাহার কোনো একটি বিশেষ ভাবের মোহে আচ্ছন্ন, তাহার নিকট জীবনের সত্যকার বিচিত্রতা কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারে না। এইজন্যই জীবনের পরিচয় লইতে হইলে আমরা ধর্ম্ম-প্রচারকের নিকট যাই না, কারণ, তিনি একটি মাত্র পথের মায়ায় আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ; আমরা যাই সেই কবির কাছে, যিনি সহৃদয় দৃষ্টি মেলিয়া জীবনকে বন্ধুর মত দেখিতে পারিয়াছেন, যিনি রাগ-বিরাগের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের অন্তহীন আনন্দের দ্বারা সমগ্রকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহার অন্তরে এই উদারতার, এই সহৃদয়তার, এই ব্যাপকতার যত অভাব, তাঁহার মধ্যে শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতার ততখানিই অভাব লক্ষিত হইবে। জীবন ও শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে নিবিড় যোগ এইখানেই বলিয়া মনে হয়।

রস ও জীবন

কোনো বস্তুকে দেখিবার তিনটি ধারা আছে। কোনো বস্তুকে লইয়া আমরা কখনো তাহার প্রয়োজনের, ব্যাবহারিক এবং সামাজিক হিতাহিতের দিক্ দিয়া যেমন তাহার আলোচনা করিতে পারি, তেমনি কখনো বা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক্ দিয়াও তাহার যাচাই করিতে পারি, আবার কখনো তাহাকে নিছক সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াও দেখিতে পারি। যখন জীবনকে লইয়া আমরা তাহার ইষ্টানিষ্টের দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে থাকি, তখন তাহা নীতিশাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়, আবার যখন জীবনকে লইয়া তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে লাগিয়া যাই, তখন তাহা দর্শনশাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু যখন জীবনকে লইয়া তাহার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে বসি, তখনই তাহা সাহিত্য হইয়া পড়ে। যে-দেখার মধ্যে আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, সেই-দেখাটিকেই সাহিত্যিক-ভাবের দেখা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই কারণেই গালাগালিও সাহিত্যিক-ভাবে দিতে পারিলে তাহাও সুন্দর হইয়া উঠে, যদিচ নীতিশাস্ত্রের দিক্ দিয়া গালাগালি কখনো ভালো হইতে পারে না। টমসনের আত্মম্ভরিতার উত্তরে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ যে সুন্দর গালি দিয়াছিলেন, সাহিত্যের রাজ্যে উহা এই কারণেই পরম সুন্দর হইয়া রহিল। আর তত্ত্বের দিক্ দিয়া যাহার মূল্য কিছুই নাই, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কোনো দিক্ দিয়াই যাহার কোনো সত্য আমরা আজও খুঁজিয়া পাই নাই, তাহাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে দেখিতে পাই: রূপকথার সৌন্দর্য্যে আমরা কে না মুগ্ধ হইয়াছি? এই কারণেই বলা চলে যে,

সাহিত্যিক-দৃষ্টি একটি স্বতন্ত্র রকমের দেখিবার ভঙ্গী। কেহ ইহাকে বলিয়াছেন রসবোধ, কেহ বলিয়াছেন সৌন্দর্য্যবোধ।

আধুনিক কালে কিন্তু সাহিত্যশিল্পীদের নিকট রস এবং সৌন্দর্য্য এই দু'টি কথাই অত্যন্ত পুরাতন, এবং সেই কারণেই বর্জ্জনীয় বলিয়াই মনে হইয়াছে। অন্ততঃ কথা-শিল্পীদের মনে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া যেন রস এবং সৌন্দর্য্যের কথা ততটা উঠে না, যতটা উঠে জীবনের কথা। তাঁহাদের মতে সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দেওয়া, বা কোনো কিছুকে সুন্দর করিয়া তোলা নহে; তাঁহারা চান জীবনের বিচিত্র জটিলতাকে তাঁহাদের ভাষার ও ভঙ্গীর দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে।

রস এবং সৌন্দর্য্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়াও একটি সমস্যা আছে; এখানে তাহা না তুলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক যে, চিনির উপলব্ধি যেমন তাহার মাধুর্য্যে, রসের উপলব্ধিও তেমনি সৌন্দর্য্যে; অর্থাৎ এক হিসাবে রস এবং সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোনো ভেদই নাই। সে যা-হোক, আমাদের বর্ত্তমান কালের প্রশ্ন হইতেছে রসের সহিত জীবনের সম্পর্ক লইয়া।

একটি পাতাকে কিম্বা ফুলকে যথার্থভাবে আঁকিবার মধ্যে শিল্পীর একটি বিশুদ্ধ আনন্দ আছে। যাহা চোকের সমুখে নিত্যই দেখিতে পাইতেছি, তাহাকেই রেখার ভঙ্গীতে, বর্ণের সমাবেশে ফুটাইয়া তুলিতে পারা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তেমনি এই জীবনব্যাপারকে আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের সমুখে কত রকমেই না ঘটিতে দেখি; অথচ ঠিক যাহা দেখিলাম তাহাকে যদি চিত্রে বা কথায় প্রকাশ করিতে যাই, তাহা-হইলেই দেখিতে পাই, আমাদের দেখিতে পাওয়াটি কত অসম্পূর্ণ। একটা গরুকে আঁকিতে চেষ্টা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, যাহাকে আমরা খুব ভালো করিয়াই জানি বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তাহাকেও আমরা

কি সামান্য জানি! তাহার দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে-একটি পরিমাণগত সামঞ্জস্য আছে, তাহার অবয়বের গঠনে যে-সব বিশিষ্টতা আছে, এই সমস্তই যে আমাদের দৃষ্টিকে ভালো করিয়া আকর্ষণ করে নাই, এই সত্যটি তখন ভালো করিয়াই বুঝিতে পারি। কথা-শিল্পের বেলাও তেমনি কোনো একটি সামান্য ব্যাপারকেও কথা দিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য একটি বিশেষ শক্তির প্রয়োজন আছে। এই শক্তি যাঁহার মধ্যে আছে, তাঁহার এই শক্তির চর্চ্চায় একটি বিশিষ্ট আনন্দও আছে।

বর্ত্তমান কালের শিল্পীর দৃষ্টি খুব বেশী পরিমাণে এই দিকেই পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা জীবনের যে-কোনো একটা ব্যাপারকে কথা-চিত্রে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেই আপনাদের প্রয়াসকে সার্থক এবং সফল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা কথা-চিত্রে আর কোনো রস বা ভাবের প্রকাশকে শিল্প-সৃষ্টির আদর্শ বলিয়া মনে করেন না। রসপন্থী শিল্পীরা কিন্তু জীবন ব্যাপারকেই শিল্পের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না; সেই কারণেই লোকোত্তর রস-সৃষ্টিকেই তাঁহারা আপনাদের সাধনার বস্তু বলিয়া মনে করিতেন।

সাধারণ মানুষ কোনো একটি চিত্র দেখিতে গিয়া তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে পারে না। তাহার নিজের প্রকাশ করিবার প্রয়াস এবং শক্তি কোনটাই তেমন নাই বলিয়াই সে শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ-ভঙ্গী দেখিয়াও কোনোরূপ উল্লাস অনুভব করিতে পারে না। রাস্তায় একটা ষাঁড় দেখিলে যেমন তাহার মনে কোনো পুলক সঞ্চার হয় না, তেমনি চিত্রেও সুবর্ণিত ষাঁড় দেখিয়া তাহার মনে কোনোরূপ ভাবান্তর হয় না। কিন্তু একজন চিত্র-শিল্পী ওই চিত্র দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতে পারেন; কারণ, তাঁহার নিকট প্রকাশের বিষয়টা একটা নিতান্ত গৌণ ব্যাপার, উপলক্ষ মাত্র; তাঁহার নিকট ওই প্রকাশটিই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

কিন্তু সাধারণ মানুষ চিত্রের মধ্যে চিত্রণের সন্ধান করে না, সে তাহার মধ্যে রসের সন্ধান করে।

এইখানে রসের কথা একটু না বলিলে চলে না, অথচ রস এমনই একটি বস্তু-যাহাকে কোনা সংজ্ঞা দিয়াই সুনির্দ্দিষ্ট করা চলে না। বহির্জগৎ এবং বহির্জীবনের বস্তু-সত্তা আমাদের অন্তরের ভাব-সত্তার যোগে বিচিত্র হইয়া উঠে; বাহিরের যে-বস্তুকে আমরা অতি-সাধারণ বলিয়া দেখিয়াও দেখি না, তাহারই ওপর যখন আমাদের ভাব-চেতনার দীপ্তি আসিয়া পড়ে, তখন তাহাকে আর না দেখিয়া থাকিতে পারা যায় না; অতি-সাধারণের মধ্যে তখন অপরূপ বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। এই যে ভাব-দীপ্ত বস্তু-সত্তার অভিনব রূপ, ইহাই প্রাচীনের রসরূপ; ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ধ্যানী কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছিলেন,

> "The gleam,
> The light that never was on sea or land,
> The consecration, and the poet's dream."

জগতের এবং জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে তাহার বাস্তব সত্তাকে ছাড়াইয়াও একটি ভাব-সত্তা আছে; রসিক ভাবুকের দৃষ্টিতেই সেই ভাব-সত্তা প্রকাশ পায়; এবং যদি সেই ভাব-সত্তাটিকে রসিক শিল্পী তাঁহার প্রকাশ-নৈপুণ্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহা রসরূপে পরিণত হয়। যতক্ষণ কোনো একটি বস্তু এই ভাব-বর্জ্জিত রূপ লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ততক্ষণ উহা আমার চিত্তকে রসাভিষিক্ত করে না। খাদ্যবস্তুর রসবোধ করিতে হইলে তাহার সহিত যেমন রসনার রসের একটি নিবিড় যোগ হওয়া চাই, তেমনি কথাবস্তুর রসটিকে শিল্পী আপনার অন্তরের ভাবের নিবিড় যোগেই উপলব্ধি করিতে পারেন। তখনই জীবন এবং জগতের মর্ম্মকোষে যে-আনন্দ সুসুপ্ত হইয়া আছে, আমাদের চিত্ত তাহার আস্বাদনে মুগ্ধ এবং মগ্ন হইয়া যায়।

এই যে বস্তুর এবং জীবন-ব্যাপারের ভাবময়রূপ, ইহার সহিত নৈতিক ভালো-মন্দের কোনো যোগাযোগ নাই, এই কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই বিশ্বজগতে ভালোমন্দের কোন স্থান নাই, অথবা জীবনে ভালোমন্দের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রভাব নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারে না। এই ভালো-মন্দকে লইয়া মানুষের জীবন চলিয়াছে, সুতরাং জীবনকে লইয়া কাহিনী রচনা করিতে গেলে কথা-শিল্পীকে এই ভালোমন্দের যথাযথ লীলা দেখাইতে হইবেই। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবেই যে, কথা-শিল্পীর উদ্দেশ্য ওই ভাল এবং মন্দের নৈতিক মূল্য-নির্দ্দেশ নহে। দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল বলিয়াই এমন করিয়া তাহার হতভাগ্য জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল, এই নীতি-শাসনটিকে দম্ভভরে প্রচার করিবার জন্যই শরৎচন্দ্র দেবদাস লিখিয়াছেন, এ কথা কোন নীতিউন্মাদ ব্যক্তি বলিলেও আর কেহই বলিবে না। দেবদাসের ওই সকরুণ পরিণাম তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনেরই সঙ্গে কার্য্যকারণ-সূত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে বাঁধা, একথা হয়ত প্রমাণ করাও কঠিন নহে। কিন্তু দেবদাস আমাদের নিকট সেই ভাবে কোন নীতি প্রচার করিতে আসে নাই; ওই কার্য্যকারণের উপলক্ষ্য ধরিয়াই দেবদাসের জীবনের মধ্য দিয়া কি নিদারুণ কারুণ্যই না মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে! ভাবময় সত্তার দিক্ দিয়া দেবদাস বিধাতার একটি সকরুণ সৃষ্টি! কেহ কেহ নিখিলেশের উপর এই বলিয়া রাগ করিয়াছেন যে, স্বামী হইয়া সে এমন করিয়া তাহার স্ত্রীর আসন্ন অমঙ্গল দেখিয়াও হাত-পা ছাড়িয়া বাথায় নীরব হইয়া রহিল, ইহা তাহার পুরুষ-চরিত্রের দুর্ব্বলতা। যাঁহারা এই ভাবে নিখিলেশ-চরিত্রটিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাও রসের দিক্ দিয়া ইহাকে দেখিতে পারেন নাই; তাঁহাদের মধ্যকার নৈতিক এবং সামাজিক হিতাহিত বিবেচনাপরায়ণ মানুষটিই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাঁহারা নিখিলেশ-চরিত্রের যে-রসরূপটি, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে

পারেন নাই। সুনীতি-দুর্নীতির দিক্ দিয়া কথা-সাহিত্যের বিচার করিতে অগ্রসর হইলে রসের দিক্ দিয়া আলোচনা করা হয় না; অথচ কথা-সাহিত্যে রসের আবেদনটিই রসপন্থীর সব চেয়ে বড় কথা।

বর্ত্তমান কালে কিন্তু সাহিত্যকে নৈতিক দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে যেমন কথা-শিল্পীর আপত্তি আছে, তেমনি রসের দিক্ দিয়া আলোচনা করিতেও অনিচ্ছা দেখা যায়। ভালোমন্দ লোকেরা নানা রকমের আলোচনাই করেন, কিন্তু আধুনিক কথা-শিল্পীদের সৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে রস-সৃষ্টির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা দেখা যায়। আসল কথা হইতেছে, তথাকথিত বাস্তববাদ কথা-শিল্পীর দৃষ্টিকে বিশ্বজগতের ভাব-সত্তার দিক্ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রসরূপের উপলব্ধি করিতে হইলে বাহিরের বস্তুকে অন্তরের ভাবের দ্বারা নিবিড়ভাবে রসায়িত করা চাই, অন্তরের ভাবদীপ্তি দিয়াই বাহিরের বস্তুকে শিল্পী রসে পরিণত করেন অথবা অন্তরের ভাবরসের যোগেই বস্তুর অন্তর্নিহিত রসময় সত্তাকে শিল্পী উপভোগ ও উপলাভ করেন। আধুনিক সাহিত্যিক কথা-সাহিত্যকে নির্ব্যক্তিক অর্থাৎ অন্তরের ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে ব্যগ্র। যে কথা-বস্তুকে তিনি রূপ দিয়া সাহিত্যে উপস্থিত করিতে চান, তাহার সহিত তিনি তাঁহার নিজের কোনো আনন্দ-বেদনার উপলব্ধিকেই প্রকাশ করিতে চাহেন না। বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁহার অভিজ্ঞতাকে একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট গণ্ডী হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসুক, আধুনিক সাহিত্যিকও যেন জীবনকে তেমনি নির্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার উপর দাঁড় করাইতে ব্যগ্র। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার উপর আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ রঙ পড়িতেছে, তাহাকে এড়াইবার উপায় নাই। এই কারণেই দুইজনের একই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান কখনো একেবারে এক হইতে পারে না। অথচ বিজ্ঞান চায় বস্তুসম্বন্ধে সেই জ্ঞান, যাহা সকল ব্যক্তির পক্ষেই এক,

সাধারণ। ইহা করিতে গিয়া বিজ্ঞান অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য বাস্তবিক কতখানি সত্য, তাহা লইয়া নানা সংশয় আছে। সে যাহাই হউক, বিজ্ঞান তত্ত্বের দিক্ দিয়া যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্য বিজ্ঞানের সহিত মিতালি করিতে গিয়া রূপায়নের দিক্ দিয়া সেই পন্থাই ধরিবার প্রয়াস করিতেছে। সে জীবনকে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিতেছে, ইহাই সত্যকার জীবন, অর্থাৎ ইহার মধ্যে শিল্পী আপনার রসবোধ দিয়া, খুসী হইবার এবং খুসী করিবার "সস্তা প্রবৃত্তি" (cheap sentiment) দিয়া জীবনকে 'অসত্য' এবং বিকৃত করেন নাই; তিনি জীবনকে একেবারে তাহার খাঁটি স্বরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আধুনিক কথা-শিল্পীর মনে এইরূপ একটি অভিমান দেখা দিয়াছে।

কোনো সাহিত্যিক অথবা কথা-সাহিত্যিকের পক্ষেই এইরূপ নির্ব্যক্তিক হওয়া যে সম্ভব নহে, সে কথা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।* এখানে সে আলোচনার স্থানাভাব। তবে বলিতেছিলাম যে, আধুনিক শিল্পী যতই সত্য করিয়া এবং নির্ব্যক্তিক (impersonal) করিয়া জীবন-বস্তুকে আঁকিয়া ধরিবার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহার প্রত্যেকটি রেখাপাতের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার ছাপ না পড়িয়াই পারে না। রসপন্থী সাহিত্যিক তাঁহার কথা-বস্তুকে তাঁহার নিজস্ব রসবোধ দিয়া রঞ্জিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; কিন্তু বিজ্ঞানপন্থী সাহিত্যিক তাঁহার ব্যক্তিগত রসবোধকে যথাসম্ভব ছাঁটিয়া এবং চাপিয়া বস্তুর রূপ আঁকিতে গিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে শুধুই যে রসবর্জ্জিত করিতেছেন তাহা নহে, তিনি কতকটা বৈজ্ঞানিক সত্যের মায়ায় মোহগ্রস্তও হইতেছেন। আধুনিক জগতে অর্থ-নৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি নানারূপ

* 'শিল্পে আত্মপ্রকাশ' (কালিকলম, ফাল্গুন, ১৩৩৩)

বৈজ্ঞানিক মতবাদ একেবারে খাঁটি সত্যের মর্য্যাদা পাইয়া বসিয়াছে এবং অনেক শিল্পীর দৃষ্টি এই সব মতবাদের দ্বারা বিকৃত না হউক, অন্ততঃ অনুরঞ্জিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তাঁহারা মানুষকে এবং তাহার জীবনকে এই সব মতবাদের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেখিয়াও তাহাকে একেবারে খাঁটি সত্য বলিতে দ্বিধা অনুভব করেন না; কারণ, বিজ্ঞানের সত্য-বোধের দম্ভ আজ অপরিসীম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ত্তমান কালের যৌন-মনস্তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, আধুনিক সাহিত্য উহা দ্বারা কতখানি আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

ফ্রয়েডের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, তাঁহার সাইকো-এনালিসিসের তত্ত্ব আজ বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক, আমরা কথায় কথায় আওড়াইয়া থাকি; তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, মানুষের অন্তরে সর্ব্বপ্রকার হৃদয়াবেগই স্থূল কামের নামান্তর এবং ছদ্মবেশ বলিয়া একটা ধারণা খুব সস্তাদরে আমাদের চিন্তারাজ্যে বিকাইতেছে। আজ তাই নর-নারীর ভাবসম্পর্কের মধ্যে আর কোনো বিচিত্রতাই নাই; সবই আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতার দৃষ্টিতে একেবারে নিছক কামবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই যে আধুনিক মনোভাব, ইহাও আধুনিক কালে সকলের মনোভাব নহে; যাহা বর্ত্তমান কালেই বিজ্ঞানজগতেও একেবারে নির্ব্বিচারে এবং নির্ব্বিবাদে গৃহীত হয় নাই, তাহাই যখন আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে একেবারে সত্যের মর্য্যাদা পাইতেছে দেখিতে পাই, তখন তাহাকে একটা সাময়িক মতবাদের মোহ না বলিয়া কি করিয়া সত্যকার জীবন-বোধ বলিয়া স্বীকার করা যাইবে, বুঝিতে পারি না। আধুনিক সাহিত্যের অনেকস্থলে এই মতবাদের মোহ দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে মানবচরিত্রকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা জটিলতার দ্বারা বিচিত্র করিয়া সমস্ত জটিলতার মূলে কামবৃত্তির ক্রিয়া দেখানোর চেষ্টাও দেখা দিয়াছে, এবং এই কারণেই জীবনের মধ্য হইতে ভাব-

গাম্ভীর্য্য এবং আদর্শবাদের দীপ্তি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। * জীবনের ভাবগত এবং রসগত মূল্য না থাকিলেও আধুনিক কথা-সাহিত্যিকের নিকট জীবন একেবারে বর্ণহীন হইয়া যায় নাই। জীবনের নিতান্ত যাহা বাহিরের প্রকাশ, তাহার মধ্যেও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই; নিতান্ত সাধারণ জীবনও জটিলতা এবং বিচিত্রতায় পূর্ণ। সেই কারণেই জীবনের যাহা মহনীয় এবং মহিমাময়,জীবনের মধ্যে যাহা অপূর্ব্ব রসময়, তাহার কথা না বলিয়া আধুনিক কথা-সাহিত্যিক যে-জীবন অতি সাধারণ, এমন কি নানাভাবে শীর্ণ, ক্ষীণ এবং বিকারগ্রস্ত, তাহাকেই হর্ষভরে আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ যেন বুভুক্ষিত মানবাত্মার অট্টহাসি। বর্ত্তমান যুগে জীবনের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে জীবনের একটা মহিমা ছিল; মানুষ বিশ্বাস করিত, যত বাধাগ্রস্তই হোক এ জীবনের একটি সুবিপুল অর্থ আছে; একটা অপরূপ অধ্যাত্মবোধের দ্বারা জীবন গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের জীবন একরকম অর্থহীন বলিলেও চলে; ইহার কোনো সুনির্দ্দিষ্ট পরিণাম নাই; অন্ধকার জীবনের আদ্যোপান্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং এই নিরন্ধ্র অন্ধকারকে আর্ত্ত করিয়া জীবনের নিদারুণ কান্না আকাশকে বেদনাতুর করিতেছে। বর্ত্তমান সাহিত্যে নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ, বিখণ্ডিত, মলিন জীবনই

*পূর্ব্বেকার সাহিত্যিক রীতি-নীতিকে অস্বীকার করিয়া যে নব-সাহিত্যিক রীতি-নীতির আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক বলা হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, আধুনিক কালে রসপন্থী কথা-সাহিত্যিক নাই ও হইবে না, তাহা নিতান্তই ভুল হইবে। নব-সাহিত্যিক রীতি-নীতির মূলে নানারূপ শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, আলোচনার সুবিধার জন্য একটি কোন বিশেষ প্রেরণাকেই একেবারে একান্ত করিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। পাঠক যেন তাহাকেই নব-সাহিত্যের একমাত্র বস্তু বলিয়া মনে না করেন।

সত্যকার জীবনের মর্যাদা পাইয়া বসিয়াছে। ইহার মধ্যে রস নাই, আনন্দ নাই, হর্ষ-উল্লাস নাই, আছে একটা ঘোর অবিশ্বাস, এবং জীবনের উপর ব্যঙ্গপূর্ণ উপহাস। কখনো কখনো এই অবিশ্বাস, উপহাস—মানব-ভাগ্যের অসারতার প্রতি কারুণ্যে কোমল। সে কারুণ্য অশ্রুকোমল হইলেও তাহার পশ্চাতে কোনো সান্ত্বনা নাই।

প্রবন্ধ-শিল্প

সাহিত্যের ভাণ্ডারে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব—এ-সবই স্থান পায়, কিন্তু আমরা ইহাদের কোনোটিকেই সাহিত্য বলিয়া গ্রাহ্য করি না। বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিতে কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাসই মুখ্যভাবে বুঝিয়া আসিতেছি। রান্নাঘরে দা-বঁটি, থালা-বাটি, তরি-তরকারি, এ-সব থাকিলেও ওগুলিকে যেমন কেহই রান্না বলে না, এও তেমনি। রান্নাঘরে তরি-তরকারি, চাল-ডাল-মসলা, এ-সবই যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, ততক্ষণ ইহাদের কোনো বিশেষত্ব নাই। রান্নাঘর হইতে যখন খাবার তৈরী হইয়া বাহির হইল, তখন একটা অভিনব বিশেষত্ব লইয়া বাহির হইল। সেই বিশেষত্বটি হইতেছে যিনি রান্না করেন, তাঁহার রাঁধুনীপনার বিশেষত্ব। সুন্দর হোক, অসুন্দর হোক, তখন সেই বস্তু একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ পাইল। বিশুদ্ধ সাহিত্য-বস্তুটি হইতেছে তেমনি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, এ-সবের মধ্যে মুখ্যভাবে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের কোনো পরিচয়ই নাই ; যে পরিমাণে উহারা ব্যক্তিত্বের গন্ধহীন, সেই পরিমাণেই উহারা বিশুদ্ধ। সাহিত্যে ঠিক ইহার উল্টা হইয়া আসিতেছে। সাহিত্যে মুখ্যবস্তু রচয়িতার অন্তর। স্রষ্টার বিশেষত্ব, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিমাণে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে পরিস্ফুট, সেই পরিমাণেই তিনি সার্থক। সত্য সাহিত্য অর্থাৎ শিল্প হইতেছে ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ। এই কারণেই সাহিত্যে বিষয়বস্তুটির খুব বড় স্থান নাই। যিনি শিল্পী তিনি যে বিষয় আলোচনা করিতেছেন, সে-বিষয়টি কি-রকম গুরুতর, তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতে চাই তাঁহার সেই বিষয়-বস্তুটিকে লইয়া নাড়া-চাড়া করিবার ভঙ্গী। কতখানি সোনা কিম্বা তামা লইয়া শিল্পী মূর্ত্তি গড়িতে বসিয়াছেন,

ধ্যানী বুদ্ধের অথবা একটা মাতালের মূর্ত্তি শিল্পী রচনা করিতে বসিয়াছেন, এ-সব বিচার বিবেচনা সাহিত্যের নহে, শিল্পের নহে। আমরা শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টির পরিচয় চাই। গোলাপ ফুলই হোক, কিংবা নির্ম্মল নীলাকাশই হোক, বর্ষা-রজনীর ঘনঘটাই হোক, কিংবা তরুণীর প্রথম ভালোবাসাই হোক, এ-সব চিরকালই তো এক ; বৈজ্ঞানিক অথবা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইহাদের তথ্যগত মূল্য চিরকালই এক। কিন্তু তথ্যের অন্তরালে একটি নিত্য-নবীন সত্য রহিয়াছে, যাহাকে দেখিয়া দেখিয়া কোনো শিল্পীরই 'নয়ন না তিরপিত ভেল'। কবির দৃষ্টি, শিল্পীর দৃষ্টি নিত্য নবীন হইয়া সত্যের অশেষ রূপ-রহস্যকে আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে। তাই তো বর্ষা-রজনীর কাব্য পুরানো হইল না, তরুণীর ভালোবাসা শিল্পীর তুলিকাকে ক্লান্ত করিতে পারিল না, নীলাকাশের নির্ম্মল শান্তি একঘেয়ে হইয়া উঠিল না। শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মধ্য দিয়া আপনার অপরূপ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেন বলিয়াই সেই ব্যক্তিত্বের আলোকে বিশ্বজগতের চিরপুরাতন বস্তুরাশি চিরনবীন হইয়া উঠে।

সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ চাই। আমাদের ভাষায় বলিয়া নহে, সব ভাষাতেই একশ্রেণীর রচনা আছে, যাহাকে আমরা 'প্রবন্ধ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই শ্রেণীর রচনাকে আমরা সাহিত্যের মর্য্যাদা দিতে পারি কি না, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, প্রবন্ধ লেখা হইতেছে নিতান্ত অক্ষম লেখকের কাজ। যাহারা বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক কোনোটাই হইতে পারিল না, তাহারাই তাহাদের মামুলি চিন্তাগুলিকে কোনো রকমে প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ-লেখক হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যাঁহারা প্রবন্ধকে এইরূপ অবহেলার দৃষ্টি দিয়া দেখেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রবন্ধের জাতি-নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। ছোট ছোট ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক

আলোচনা প্রবন্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। আমরা এইগুলিকে ঠিক সাহিত্যিক প্রবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব না। এই সব লেখা বাদ দিলেও আমরা প্রবন্ধশ্রেণীর মধ্যে আর এক রকমের লেখা পাই, যাহার মুখ্যবিষয় বস্তুসম্বন্ধে গবেষণা নয়। কবি যেমন তাঁহার ছন্দময়ী বাণীর মধ্য দিয়া আপনার একটি বিশেষ আনন্দ-বেদনাকে, আপনার নিজস্ব দেখাটিকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দ পান, বন্ধু যেমন বন্ধুর কাছে বসিয়া তাঁহার ভাবনাবেদনার, আশানিরাশার কথা বলিয়া তৃপ্তি পান, তেমনি একশ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, যাহার মধ্যে লেখক শুধু পাঠকের নিকট আপনাকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

যখন আমরা তর্ক করিতে বসি, তখন সেই তর্কের মধ্যে আপনার মতটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা প্রবল ঝোঁক থাকে, তাহাতে আনন্দ থাকে না, একটা সংগ্রামের প্রয়াস সেখানে সুস্পষ্ট। যখন আমরা একটা কোনো বিশেষ শ্রমলব্ধ গবেষণা লইয়া আলোচনা করিতে থাকি, সেখানেও গবেষণার অহমিকা বা গুরুগম্ভীর ভাব আসিয়া বন্ধুর সহিত বন্ধুর আনন্দের মাঝে যে আপনার স্বতঃউচ্ছ্বসিত অবারিত প্রকাশ, তাহাকে আবৃত করিয়া রাখে। উপদেশ দিতে বসিলে তো কথাই নাই। এই সব আলোচনার মধ্যে ব্যক্তির আত্ম-প্রকাশের সহজ আনন্দটি প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু যখন বন্ধুর হাতে হাত রাখিয়া আমরা জীবন-জগৎ লইয়া নানা কথা বলিয়া যাইতে থাকি, তখনকার সেই বলার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রাম নাই, বড় করিয়া ধরিবার উগ্রতা নাই, উপদেষ্টা এবং জ্ঞানীজনের বেশী-জানার অহমিকা এবং গাম্ভীর্য্য নাই, নির্ভুল হইবার সতর্কতা নাই। এইরূপ কথা-বলার সহিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটি মিশিয়া যায়। কথা শুনিতে বসিয়া কথা-শোনাটাই বড় হইয়া উঠে না, বন্ধুর অন্তর-রূপ-খানিই বন্ধুর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। এক শ্রেণীর

প্রবন্ধ আছে, যাহা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন এমনি একজন বন্ধুর হাতে হাত রাখিয়া তাহার অন্তরটিকে স্পর্শ করিতেছি।

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সহিত গীতি-কবিতার একটা সাদৃশ্য আছে। শ্রীযুত প্রিচার্ড বর্ত্তমান কালের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এই কথাটি বেশ সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন :—

"So lyric and essay are both pre-eminently expressions of personality, but whereas one is the embodiment of rare moments of passion and exaltation, the other is the expression of those quiet every-day moods, when one is at leisure and peace, yet not all at ease··· Just because it is so apt an expression of every-day personality, the essay is one of the most elusive of literary forms."—*Essays of Today*.

গীতি-কবিতার মধ্যে পাই অন্তরের তীব্র অনুভূতির প্রদীপ্ত প্রকাশ, অনুভূতির দীপ্তি কবির ব্যক্তিত্বকে অকস্মাৎ যেন আশ্চর্য্য রকম উজ্জ্বল করিয়া তোলে। কিন্তু আমাদের জীবনে এই সব তীব্র অনুভব-মুহূর্ত্ত ভিড় করিয়া আসে না। তা' বলিয়া জীবন কি তাহার প্রকাশ স্তব্ধ করিয়া থাকে? যাঁহারা একটুখানি জীবন সম্বন্ধে সচেতন, তাঁহাদের অন্তরে প্রতিনিয়তই একটি অনুভবের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। চারিদিকের বস্তু-জগৎ, চতুষ্পার্শ্বের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার তাঁহাদের চিত্তে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। এই যে মৃদু অনুভূতি এবং ভাবনার ধারাটি, ইহাকে কবিতায় প্রকাশ করা চলে না। অথচ এই যে জগৎ ও জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক সংস্পর্শে আমাদের অন্তরে ভাবনা এবং অনুভূতির একটি মধুর আন্দোলন, ইহারও একটি সৌন্দর্য্য আছে, রূপ আছে। ইহাকে প্রকাশ করিতে পারিলে ইহাও শিল্প হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, ইহার মধ্যে আমরা মানুষের

পরমাশ্চর্য্য ব্যক্তিসত্তারই একটি প্রকাশ দেখিতে পাই। প্রবন্ধের লঘুদেহের লীলায় এই প্রকাশটি সম্ভব। যে প্রবন্ধে এই প্রকাশটি সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই সত্যকার সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ভাল কথা শুনিবার, জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর একটি প্রয়োজন মানুষের মধ্যে আছে, যাহার তাগিদ সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যের অন্তরে। বিশ্বজগতের প্রয়োজনের দিক্ দিয়া তাহার কোনো মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বমানবের অন্তরাত্মার নিকট তাহার এমন একটি মূল্য আছে, যাহা সকল প্রয়োজনের বাড়া। বিশ্বজগতের শব্দে-স্পর্শে, রূপে-গন্ধে মানুষ এক অপূর্ব্ব আনন্দরসের আস্বাদন চায়; কলাশিল্পে ও সাহিত্যে মানুষের এই আনন্দানুভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্বজগতের এবং মানব-ব্যক্তিত্বের এই যে অপূর্ব্ব রস-রূপ, ইহা সর্ব্বক্ষণই আমাদের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হয় না, হইতে পারে না। কখনো কোনো দৈবদীপ্ত মুহূর্ত্তে এইরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে শিল্পীর অন্তরে; শিল্পী তখন তাহাকে কথায় ও ছন্দে, সুরে ও বর্ণে, রেখা ও গতির ভঙ্গিমায় মূর্ত্ত করিয়া চিরন্তন সম্পদ্ করিয়া ধরেন। যিনি সত্যকার শিল্পী ও সাহিত্যিক, তাঁহার অন্তরে এই রসোপলব্ধির ক্ষমতা অসাধারণ বলিয়া আর আর মানুষের চেয়ে বেশী করিয়া তিনি এই রসটিকে দেখিতে পান। শিল্পীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মুহূর্ত্ত। কিন্তু এই মুহূর্ত্তগুলি বাদ দিলেও শিল্পীর জীবনের এমন একটি বিশিষ্টতা আছে, যাহার দ্বারা তিনি সব সময়ই এই জীবন ও জগৎকে নূতন ভাবে দেখিয়া থাকেন। রহস্য এবং সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া জীবনকে দেখিবার একটি সাধনা তাঁহার আছে। এই সাধনা শুধু একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাই নিমেষে নিমেষে এই আলোছায়ার জগৎ, এই হাসিকান্না ও সুখ-দুঃখের জগৎ,

এই বিচিত্র সৃষ্টি-প্রবাহ জীবন-শিল্পীর অন্তরকে অপরূপ আনন্দে আন্দোলিত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তের এই সব অতি সামান্যের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে যে শিল্পীর একটি বিশেষ আনন্দ রহিয়াছে, সেই আনন্দের প্রকাশ পাই প্রবন্ধ-সাহিত্যে।

কাব্য-সাহিত্য জীবনের অসাধারণ মুহূর্ত্তগুলিকে রূপ দিয়া জীবনকে কল্পলোকের দিকে উর্দ্ধায়িত করিয়া তোলে। প্রবন্ধ-সাহিত্য জীবনের দৈনন্দিন গতিপথে তাহার প্রতি-নিমেষের রূপটিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তোলে। কাব্যসাহিত্য এতকালে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, প্রবন্ধ-সাহিত্য তাহার তুলনায় নিতান্তই দীনহীন। তাহার কারণ, প্রবন্ধ-সাহিত্যের বয়স অত্যন্ত অল্প। প্রথমতঃ, প্রবন্ধের আদর্শ এবং কাঠামোটি আমরা ইংরাজী সাহিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংরাজী সাহিত্য দীর্ঘকাল এই প্রবন্ধ-শিল্পের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে ধীরে ধীরে প্রবন্ধ বিশুদ্ধ সাহিত্যরূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে এখনো প্রবন্ধও যে একটা বিশেষ শিল্প হইতে পারে, তাহার ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। আমাদের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক রচনা, সবই প্রবন্ধ নামের মধ্যে ভিড় করিয়া একাকার হইয়া আছে; সাহিত্যিক প্রবন্ধ হইতে অন্যান্য রচনার যে একটি প্রকৃতিগত ব্যবধান রহিয়াছে, সেদিকে আজও আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। ইংরাজী সাহিত্যেও এই ভেদাভেদবর্জ্জিত একাকারতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সমালোচকেরা যে-কোন রকমের আলোচনাকে 'essay' বলিতে রাজি নহেন। যাহার মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আছে, যাহা নির্ব্যক্তিক (impersonal) আলোচনা মাত্র নহে, তাহাকেই ইংরাজ সমালোচকেরা essay বা প্রবন্ধ বলিতে সুরু করিয়াছেন, এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক বিষয়কে 'study',

'article', 'treatise' ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমাদের সাহিত্যে এইরূপ বিভিন্ন নামকরণের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, নামকরণের দ্বারা যদি সাহিত্যিক প্রবন্ধকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে লেখকগণের এই সম্বন্ধে চেতনা সুস্পষ্ট হইবে, এবং সত্যকার প্রবন্ধ-শিল্পের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

মনে হয়, আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষাও অনেক পরিমাণে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিপন্থী হইয়াছে। সেই শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ-বাইশ এবং ততোধিক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা স্কুলে কলেজে প্রবন্ধ-রচনা শিক্ষা করিয়া থাকি। স্কুল-কলেজ আমাদিগকে যে-প্রবন্ধ লিখিতে শেখায়, তাহার মধ্যে লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-বস্তুটির কোনো স্থান নাই বলিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াই বলিয়াছেন,—"সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল।" প্রবন্ধ-রচনায় আমরা সেই ভুলটিকে যথাসাধ্য পাকা করিয়া তুলি। আমরা যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে বসি, কিন্তু স্কুল-কলেজ আমাদের হাতে নির্ম্মাণ করিবার স্বাধীনতা দেয় না। কর্ত্তৃপক্ষের কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের রেখায় রেখায় পা ফেলিয়া আমাদিগকে রচনায় অগ্রসর হইবার বিধান দেওয়া আছে। 'ঘোড়া' সম্বন্ধে রচনা করিতে হইলে উহা একটি চতুষ্পদ জন্তু এই বলিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বালকের মনে ওই জন্তুটি হয়ত কত বিচিত্র ভাবনা, কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগায়, কোথাও কারুণ্য হয়ত জাগিতে চায়; কিন্তু বালককাল হইতে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার এই বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া নিতান্ত নির্ব্যক্তিকভাবে রচনা লিখিবার শিক্ষাই

আমরা স্কুলে-কলেজে পাইয়া থাকি। ফলে, রচনা একটা মিলিটারী ড্রিল মাত্র হইয়া দাঁড়ায় ; ইহাতে পরীক্ষকগণের মস্ত সুবিধা আছে। হাজার করা ন'শো নব্বই জনের রচনার মধ্যে পরীক্ষক পান এক ছাঁচ, এক ধাঁচ—একই তথ্যের, একই ভঙ্গীর সমাবেশ। ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব যেখানে ঘটে, সেখানেই নানা বিপদ্ ; সেখানে পদে পদে তথ্যকে ছাড়াইয়া অভিনবের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। ব্যক্তিগত দৃষ্টি এবং অনুভবের এই স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকত্ব এবং অভিনবত্বকে বরদাস্ত করিবার শিক্ষা আমাদের মধ্যে নাই ; তাহার সত্যকার মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। অথচ স্কুল-কলেজ তাহার গজ-কাঠির সুবিধার খাতিরে এই যে মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর প্রণালীকে স্থান দিয়াছে, তাহার ফলে শিক্ষার মধ্যে আনন্দ নাই—আমরা কতকগুলি প্রাণহীন কলের পুতুলমাত্র তৈরী করিয়া মরিতেছি।

যদি স্কুল-কলেজে কবিতা এবং গল্প লিখিবারও ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গ-সরস্বতীর কি যে দুরবস্থা হইত তাহা কল্পনা করিতেও গা কাঁটা দিয়া উঠে! যাহা হউক, দীর্ঘ শতাব্দী পরে শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে দেখিয়া আশা হয়। নব শিক্ষারীতি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে তথ্য-সংগ্রহের চেয়ে বড় করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রবন্ধ-রচনা বলিয়া নহে, সব রকমের শিক্ষাই যাহাতে বাহিরের স্তূপ রচনা না হইয়া প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইতে পারে, সেই দিকে নব শিক্ষাপ্রণালীর প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষারীতি কবে যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনুসৃত হইবে, অবশ্য তাহা অনুমান করিতেও ভরসা হয় না। এক একটি মামুলি কথা, যাহা চোদ্দ বছরের বালক বুঝিতে পারে, শিক্ষাবিভাগের বিজ্ঞ কর্ত্তাদের তাহা বুঝিতে সারা-জীবন কাটিয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংস্কৃত শিক্ষার কথাই বলি। ছেলেরা সংস্কৃত শিখুক, ইহাই আমরা কামনা করি। অথচ দীর্ঘকাল ধরিয়া

সংস্কৃত শ্লোকের নিখুঁত অনুবাদ ইংরাজীতে ছেলেরা না দিতে পারিয়া ব্যর্থ হইয়া মরিয়াছে। সাধারণ বাঙলার ইংরাজী করিতে গিয়া বড় বড় বিদ্বানেরা যেখানে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন, সেখানে নূতন সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর নিকট সংস্কৃতের ইংরাজী অনুবাদ প্রার্থনা করা যে কত বড় বাতুলতা, তাহা বুঝিতে কর্ত্তাদের একটা যুগ কাটিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম যে, নব শিক্ষারীতি লইয়া চিন্তাজগতে আন্দোলন যথেষ্ট চলিলেও উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে আমাদের দেশে কতকাল লাগিবে বলা যায় না।

কিন্তু যদি স্কুল-কলেজের শিক্ষায় বালক-বালিকাদের ব্যক্তিগত বিকাশটিকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে সাহিত্যের উপর তাহার প্রভাব যে ভালই হইবে, বিশেষ করিয়া প্রবন্ধ-সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের বিচিত্র বিকাশ যে তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলার কিশোর কিশোরীদের উপযোগী

এই লেখকের

অপর দুইখানি পুস্তক

আবিষ্কার-যাত্রী

(STORIES OF DISCOVERY)

প্রাচীন, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক দুঃসাহসিক
আবিষ্কার-যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী।

যান্ত্রিক-আবিষ্কার

(STORIES OF INVENTION)

বর্ত্তমান যুগের প্রভূত কল্যাণকর বহুবিধ বৈজ্ঞানিক
যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ-কৌশলের
মনোজ্ঞ কথা।